সাধন-তত্ত্ব।

(তত্ত্বপ্রদ মনোহর গল্প।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

প্রকাশক।

অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়,

৮ নং টেমার্স লেন, ঠনঠনিয়া,

কলিকাতা।

সন ১২৯৯ সাল।

ওঁ শ্রীহরিঃ !

সাধক-হৃদয়-নিধি, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি !—তোমার 'সাধন-তত্ত্ব' তুমি নিজে না বুঝাইয়া দিলে, কে বুঝিতে পারে, প্রভু! হে ইচ্ছাময় !—তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিতে হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে, এ পাপ-পরিক্লান্ত জীবনের চির-নিরুদ্যম অনুসন্ধানে তোমায় আর মিলিবে কোথায়? কৃপাময় !—তুমি নিজে কৃপা না করিলে—তুমি আপনা-আপনিই সদয় হইয়া এ দগ্ধ হৃদয়-মরুভূমে স্বুবর্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া, তাহাতে অধিষ্ঠান না করিলে, কোথায় তোমাকে পাইব, ভগবান্ ! তাই সূচনায় তোমায় ডাকিতেছি, হে পাপিত্রাতা দীন-দয়াল ভগবান্ !—দয়া করিয়া তোমার সেই দিব্য-মূর্ত্তিতে একবার এ হৃদয়-মরুভূমিতে আসিয়া আসন পরিগ্রহ কর—মরুক্ষেত্র শান্তিক্ষেত্রে পরিণত হউক। সঙ্গে সঙ্গে, তোমারই দয়ায়, তোমারই ভাষায়, তোমারই 'সাধন-তত্ত্ব' জগতে প্রচারিত হউক! নহিলে, 'সাধন-তত্ত্ব' কি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু? তুমি স্বয়ং তাহা বুঝাইয়া না দিলে, তুমি স্বয়ং হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া—সে তত্ত্ব বুঝিবার জন্য—হৃদয়ের তন্ময়ত্ব-ভাব জন্মাইয়া না দিলে, আর কাহার সাধ্য—তোমার তত্ত্ব বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে? প্রভু !—তোমার তত্ত্ব যে চিন্তার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, বাঙ্মনোবুদ্ধির অগোচর! সে তত্ত্ব কি বুঝিবার বা

বুঝাইবার দ্রব্য? যাহাকে তুমি তাহা বুঝাইয়া দেও, সেই তাহা বুঝিতে পারে; যাহাকে তুমি তাহাতে মজাইয়াছ, সেই তাহাতে মজিয়াছে। নহিলে, তোমার তত্ত্ব কেহ বুঝিবে বা বুঝাইবে—সাধ্য কি?

হে পতিতপাবন শ্রীহরি!—পতিতোদ্ধারের ভার চিরদিনই তোমার উপর। তোমার কর্ম্ম তুমিই করিবে—তুমি না করিলে আর করিবে কে? ভরসা—চিরদিনই তোমার উপর; আত্ম-নির্ভর—চিরদিনই তোমাতে। এখন, তুমিই গতি-মুক্তি-উপায় না করিলে, কে আর উপায় করিবে, প্রভু! হে জগদীশ্বর!—এ 'সাধনতত্ত্ব' তুমি নিজে না শিখাইয়া দিলে, কিরূপ কোথায় কাহার নিকট শিখিব? তাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছি, দীন-দয়াল, পতিতের সখা তুমি, এ পাপীর উপায়-বিধান তুমিই কর, দয়াময়! এ অধম দুর্ভাগ্য জীবকে 'সাধন-তত্ত্ব' তুমি নিজেই জানাইয়া দেও, পরমপিতা!

কৃপাময়! আর কিছু চাই না—কেবল এইমাত্র চাই, আমার সেই শক্তি দেও, যে শক্তি-বলে তোমার 'সাধন-তত্ত্ব' আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রভু! আমার আর কোন অভিলাষ নাই; কেবল এইমাত্র অভিলাষ—যেন তোমার সেই ধ্যান-ধারণাতেই মতি থাকে।

প্রণত

শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মণঃ।

সাধন-তত্ত্ব।

সূচনা।

চির-আনন্দময় বৈকুণ্ঠ-ধাম। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সকলেই স্ব স্ব যোগ্যাসনে সমাসীন। অন্যান্য দেবতারাও, স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলেই সৌৎসুক্যে সমুপস্থিত—হরিপরায়ণ নারদ শুকদেব প্রভৃতি সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময়, নরকাধিপতি যমরাজ, করযোড়ে বিনীত-স্বরে নিবেদন করিলেন,—"প্রভু! নরকে তো আর স্থান নাই! আজকাল এত লোক নরকে প্রেরিত হইতেছে যে, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। কোথায় সকলকে স্থান দিব, কি করিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না! তাই প্রার্থনা, সত্বর কোন উপায়-বিধান করুন—কিরূপে, নরকগামী লোকদিগকে কোথায় থাকিবার স্থান দিব? হয়, নরকের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিউন; নয়, এত লোকের যাহাতে নরক-প্রাপ্তি না হয়, এমন একটা কোন উপায় করুন। হয়, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল সর্ব্বত্রই নরক-কুণ্ডে পরিণত হউক; নয়, জীবের যাহাতে গতি-মুক্তি হয়, এমন একটা কোন উপায় করিয়া দেন।"

দেবতাগণ, গভীর চিন্তা-সাগরে নিপতিত হইলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তিনজনেই, কত অনন্তকাল পরে, আবার সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। পৃথিবী রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, মনুজগণ দিন দিনই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহাদিগের আর উদ্ধারের উপায় কি, তখন তাঁহারা, সকলেই সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ—এত শাস্ত্রামৃত থাকিতেও, লোকে কেন সে অমৃত-রসাস্বাদনে বিমুখ?—সে শাস্ত্রসুধা পান না করিয়া, হায়, ভ্রান্ত জীব, কেন বিষম সংসার-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে?—দীনসখা, পাপিত্রাতা ভগবানের গোচরে, এমনই সকল বার্ত্তা, তখন নিবেদিত হইতে লাগিল।

কিন্তু, দেবতাগণ, তাহাতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—"এজন্মে মনুষ্যগণের উদ্ধারের আর কোনই নূতন উপায় হইতে পারে না। নিদারুণ ভবসংসার-পারের কর্ণধার-স্বরূপ এত সব শাস্ত্রগ্রন্থ মনুষ্যের জন্য রহিয়াছে—এত সব সাধন-ভজনের উপায় তাহাদিগকে শিখিতে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, তবুও তাহারা যখন এমনতর নিরয়গমন-কাম, তখন আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? তখন, কাজেই বলিতে হয়, তাহাদের এ শোচনীয় পরিণাম, এক কাল-মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু হইতেই হয় নাই। একমাত্র কলির শাসনই, মনুষ্যদিগকে দিন দিন এমনতর বিপথে লইয়া যাইতেছে। আর, সে পতন হইতে মনুষ্যের উদ্ধারের উপায়—এক যুগ-বিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুতেই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেই একমাত্র প্রলয়োচ্ছ্বাস ব্যতীত এ পঙ্কিলময় পাপরাশি বিধৌত হইবার আর কোন

উপায়ই দেখা যায় না। তাই, যত শীঘ্র শীঘ্র কলির অবসান হয়—যত শীঘ্র শীঘ্র এ সংসার সেই অতল-তলে নিমজ্জিত হয়, তাহাই করা বিধেয়।”

কিন্তু, এ মীমাংসাও সাব্যস্ত হইল না। ইহাতেও সৃষ্টি-শৃঙ্খলার নানা ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কা হইল। এক তো শাস্ত্রানুযায়ী কলির আয়ুঃশেষ না হইলে, তাহার অন্তর্দ্ধানই হইতে পারে না; তার উপরও আবার অন্য নানা বিঘ্ন-ব্যতিক্রম আছে। সুতরাং সেই লোক-পিতামহ মনুজবৎসল ব্রহ্মা, দেবতাগণকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন,—

“দেবগণ! আপনারা বিচলিত হইবেন না। এত সময় থাকিতে, এখনই যুগ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, শাস্ত্র-বিধির বিষম অবমাননা করা কখনই শ্রেয়ঃ নহে। সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত কলির শাসন যতদিন চলিতে পারে, তাহা চলুক; তারপর, যথাবিধি কার্য্য করা যাইবে। তবে এক্ষণে, কেবল এই নির্ণয় করা উচিত যে, এই সময়ের মধ্যেও মনুষ্যের গতি-মুক্তির উপায় কিছু আছে কি না? এখন কেবল ইহাই স্থির করা উচিত—কিরূপে মানুষের মনে ধর্ম্মবীজ পুনর্রোপন করা যায়? এই চেষ্টাই এখন কর্ত্তব্য।

কিন্তু, কিরূপে সে উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে?—এখনও কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, মানবকে তাহার গতি-মুক্তির পথে অগ্রসর করাণ যায়? এ তত্ত্ব, বাস্তবিকই অতি গভীর চিন্তার বিষয়। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ মনুষ্যের ক্রম-পরিণতির বিষয় ভাবিতে হয়। ভাবিতে হয়, এই মানুষ—কোন পথ দিয়া, কোন সূত্র ধরিয়া, কি অবস্থায়, কোথায়

আসিয়াছে। আর, ভাবিতে হয়, তার সেই আসার মধ্যে, তাহার কি কি প্রকার পরিণতির সম্ভাবনা। এই ভাবিলেই— ভাবিয়া, তদনুযায়ী তাহার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেই, সব দিক রক্ষা হইতে পারে; সৃষ্টি-ক্রিয়াও অপ্রতিহত থাকিয়া যায়।

তাহা কিরূপ, আরও একটু বিশদ করা যাউক। বিশদ করিতে হইলে, প্রথমতঃ ধরিতে হয়— সেই 'বীজস্থান'। বীজস্থান অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপত্তি। কিন্তু, সেই উৎপত্তি-স্থান হইতে ধরিলে, কি দেখা যায়? এই কি দেখা যায় না যে, উৎপত্তি-স্থান পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময়—উৎপত্তি-স্থান পূর্ণ-সারময়—উৎপত্তি-স্থান সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও সুপরিপুষ্ট; এবং তারপর যতই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে তাহার অবতরণ হইয়াছে, ততই তাহার জ্যোতির্হীনতা, ততই তাহার অসারতা, ততই তাহার অপরিপুষ্টতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন, প্রথম খাঁটি স্বর্ণের কোন অলঙ্কার গড়াইলে, তাহা প্রায় আসলের ন্যায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু, তারপর, সে অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া, আবার নূতন কোন অলঙ্কার তাহাতে প্রস্তুত করিলে, সে দ্বিতীয় বারের অলঙ্কার প্রথম হইতে অনেকটা খাদ-মিশ্রিত হইবে। এইরূপ, যতই তাহাকে বারবার রূপান্তরিত করিবে, ক্রমেই তাহা বিরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে। এমন কি, এইরূপ বিবর্ত্তনে পড়িয়া, ২৫৲। ২৬৲ টাকা ভরির স্বর্ণও, ক্রমে ১০৲। ১২৲ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

প্রাণী-জগতেও তাই। বংশ-বিবর্ত্তন-অনুসারে, জীবের গতি ক্রমশঃই অধোমুখে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রথমে যাঁহারা পুরুষ-সিংহ ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানেরাও ক্রমে সামান্য শৃগাল-কুকুরের ন্যায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়। জীবজগতের বংশ

পরম্পরায় প্রতি দৃষ্টি করিলে, এ তত্ত্ব আপনা-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মানুষের সন্তান অমানুষ, বীরের পুত্র নির্বীর্য্য-কাপুরুষ, বলবানের আত্মজ দুর্ব্বল—এ তো জগতের প্রতি গৃহেরই দৃশ্য! এ কথা বুঝাইতে বা বুঝিতে আর কোথাও যাইতে হয় কি? প্রতি গৃহ, প্রতি পরিবারই, ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

মানুষ যে ক্রমেই অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি, অল্পভোগী, এবং অল্পজ্ঞানী হইতেছে, এক্ষণে সে বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। আর, কালে কালে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বলিয়াই, মানুষের পক্ষে ভজন-সাধনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতিও ক্রমশঃই এত পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে! বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ--ক্রমে ক্রমে এত সব শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রচারও এইজন্যই হইয়া আসিয়াছে। সেই প্রথম মনুষ্য যাঁহারা—সেই বীর্য্যবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, প্রথম-সৃজিত মনুষ্য যাঁহারা—একখানি মাত্র বেদশাস্ত্রেই তাঁহাদের ঐহিক, পারত্রিক সকল কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইত। তখনকার লোক সেই একমাত্র বেদ-বিধিই বুঝিতে পারিতেন; এবং তাহা হইতেই আপনার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্ম স্থির করিয়া লইতেন। কিন্তু, তার পর?—তার পর যেই তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশপরম্পরায় আবির্ভাব হইল, অমনি আংশিক মস্তিষ্ক-হীনতা-ক্রমে, সেই সকল বংশধরদিগের পক্ষে, সেই নিখিল-শাস্ত্র-সমষ্টি-স্বরূপ বেদ-বিধিও হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতায় আর কুলাইল না। তাই তাঁহারা তখন হতাশ হইতে লাগিলেন—ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেকটা কমিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু, সে অবস্থায় কি করা হইয়াছিল? সে অবস্থায় তাঁহা-দিগকে সেই নিদারুণ পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য কি বিধি-

ব্যবস্থার অনুসরণ করা হইয়াছিল ? তখন, সেই একমাত্র বেদ-মধ্যে সর্ব্বকর্ম্ম-পদ্ধতির একত্র সমাবেশ থাকায়, লোকের বোধ-সৌকর্য্যার্থে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে—ক্রিয়া-পদ্ধতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এক বেদ তখনই চারিভাগে বিভক্ত হয় ; ঋক, শ্যাম, যজুঃ, অথর্ব্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বেদের বিভাগ হইয়া যায়। এক সঙ্গে সকল অনুশাসনের অবতারণা থাকায়, লোকের বুঝিবার পক্ষে বেদ-শাস্ত্র যেমন কঠিন হইয়া আসিয়াছিল, তখন, ভাগ করিয়া দেওয়ায়, সে কাঠিন্য বিদূরিত হয়—শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, লোকে আবার তদনুযায়ী পরিচালিত হইতে থাকেন। সে সময়, লোকের অভাব ও আবশ্যক বুঝিয়াই, বেদের ঐরূপ বিভাগ হইয়াছিল।

এইরূপ, আরও দেখা যায়, তৎপরবর্ত্তী বংশধরদিগের সময়ে —চারিভাগে ভাগ করিয়া দেওয়াতেও বেদমর্ম্ম বুঝিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, আবারও ঐরূপ অভিনব উপায় গৃহীত হইয়াছিল। তখন, বেদ হইতে ভাঙ্গিয়া, উপনিষদের সৃষ্টি! বেদকে উপনিষদাকারে সহজ-বোধ্য না করিলে, তখনই যে ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ পাইত ? কাজেই, আবশ্যক বুঝিয়া, লোকের গতি-মতি-বুদ্ধির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, তখন উপনিষদের সৃষ্টি হয়। বেদজ্ঞান, লোকের পক্ষে কঠিন হওয়াতেই, তখন ঐরূপ উপায় পরিগৃহীত হইয়াছিল।

এইরূপ, তার পর ?—সে বংশপরম্পরায় পর ? তখন, লোকের আর তাহাতেও কুলাইল না। ক্রমশঃই লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি এরূপ কমিয়া আসিতে লাগিল যে, তখন আর উপনিষদেও কুলাইল না। শাস্ত্রগ্রন্থ তখন আরও সরল করার প্রয়োজন

হইয়া পড়িল। আর, বলা বাহুল্য তখনই তন্ত্রের সৃষ্টি। তখন মানুষ এতই বীর্য্যহীন হইয়া আসিয়াছে যে, কোনরূপ ক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে, তাহারা আর ভগবানের বিষয় ধারণা করিতেই পারে না। কাজেই, তখন সেই ক্রিয়া-কাণ্ডময় তন্ত্রশাস্ত্র-দ্বারা লোককে পরিচালিত করা হইয়াছিল।

কিন্তু, অবশেষ!—তাহাতেও যখন মনুষ্যের বুদ্ধির সঙ্কুলান হইল না, তখন আবার তদপেক্ষাও সরলভাবে পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক, দুই, তিন, চার করিয়া, অষ্টাদশখানি পুরাণ—এইরূপেই ক্রমে সৃজিত হইয়াছে। অধিক বলিব কি?—সর্ব্বশেষে, তদপেক্ষাও লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি চঞ্চলা হওয়ায়, ক্রমশঃ শতাধিক উপপুরাণ পর্য্যন্তও সৃজিত হইয়াছে।

এক কথায়, এই যুগযুগান্তরের ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালীর প্রতি একবার অনুপূর্ব্বিক দৃষ্টি করিয়া দেখিলে, এই-ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র লোক-হিতকর কার্য্যেই বরাবর দৃষ্টি রাখা গিয়াছে। কি সদুপায় অবলম্বন করিলে, কি নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিলে, সৃষ্টিশৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে, কোন্ পথে চালাইলে বা কোন্ পথ দেখাইয়া দিলে, মানুষ ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান্ হয়, সর্ব্বকালেই, এইদিকে যত্ন করা হইয়াছে। সৃষ্টির নিয়মই এই। সৃষ্টির আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ করিয়া দেখিলে, এই তত্ত্বই সম্যক-রূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্ব-লোক-হিতকর অনুষ্ঠানই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।

সুতরাং এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, কিরূপে শাস্ত্রপ্রচার করিলে লোকের গতিমতি স্থির হয়—আবার লোকে ধর্ম্মের পথে মনকে ফিরাইয়া লইতে পারে? যখন দেখা যাইতেছে

পুরাণ, উপপুরাণ আকারে উপদেশ প্রচার করিয়াও যখন লোককে ধর্ম্মপথে আনায়ন করা যাইতেছে না—মনুষ্যের ক্ষীণ-মস্তিষ্ক সে তত্ত্বও যখন হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছে না; তখন তদপেক্ষাও কোন সরল পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আর, সেই সকল কারণেই, এখন এমন সকল ভাবে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যাহা লোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। পুরাণ-উপপুরাণের ন্যায় অত বড় বৃহৎ ব্যাপারে না যাইয়া, এখন তদপেক্ষাও সরল গল্পচ্ছলে মনুষ্য-সমাজে 'সাধন-তত্ত্ব' প্রচার করা কর্ত্তব্য। কলিরও আর অবসানের বিলম্ব নাই; মানুষও ক্রমে হীন-ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; আর অল্পদিন পরেই অবশ্য, যুগ-বিবর্ত্তনে সকল বিশৃঙ্খলারই নিবারণ হইবে। সুতরাং সেই সামান্য ব্যবধান-কালের উপযোগী করিয়া, এক্ষণে 'সাধন-তত্ত্ব' বিষয়ে লোককে আর একবার উপদেশ দিয়া দেখা যাউক। রোগীর অন্তিম অবস্থাতেও যেমন ঔষধ-প্রয়োগের বিধি আছে, গঙ্গাতীরস্থ করিয়াও লোকে যেমন রোগীকে মৃগনাভি-কস্তুরি খাওয়ায়; এ মুমূর্ষু সময়েও, সেইরূপ, মনুষ্যগণকে আর একবার 'সাধন-তত্ত্ব' বিষয়ক উপদেশ দেওয়া যাক। যেমন তাহাদের বুদ্ধি, যেমন তাহাদের ধারণা, তদনুযায়ী সরল ভাবেই—রোগীর অন্তিম ঔষধ-স্বরূপ—'সাধনতত্ত্ব' আর একবার জগতে প্রচারিত হউক।"

সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এই সর্ব্ব-লোক-হিতকর প্রস্তাবে দেবগণ সকলেই স্বীকৃত হইলেন। সৃজনকর্ত্তার সেই অভাবনীয় সর্ব্ব-লোক-স্নেহে, সকলেই পরম পরিতোষ প্রকাশ করিলেন।

ঈশ্বর মঙ্গলময়।

পরমপিতা পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন, সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য। জগতে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, সকল ঘটনাতেই মনুষ্যের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আজ যে আমি রাজরাজেশ্বর সম্রাটের অতুল পদ প্রাপ্ত হইয়া বিচলিত হইতেছি—কাল আবার সেই আমি কেন অন্নের কাঙ্গাল, দীন-দুঃখীর ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছি? আজ এই যে আমি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া, আপনাকে সংসার-সুখের চরমসীমায় উপনীত দেখিতেছি; কাল আবার সেই আমি, হয় তো অনাথ—বন্ধুবান্ধব-বিবর্জ্জিত—স্ত্রী-পুত্র-হীন—সংসারে আমার নিজের বলিতে আর কেহই নাই। এইরূপ, জগতের যাহা কিছু বিবর্ত্তন-বিচ্ছেদ দেখিতেছি, তাহার সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছার আনন্দময় ফল মাত্র। শুদ্ধ মনুষ্যের উপর দিয়া ভগবানের এ অপূর্ব্ব ক্রিয়া-কৌশল যে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা নহে। জড় প্রকৃতিও ভগবানের এ লীলাচক্রে পড়িয়া, সর্ব্বদাই সেই পরমপিতার সন্তান-সন্ততি—আমাদের শুভ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে। এই যে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশের ঘনবর্ষণ, এই যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দিগ্দগ্ধকারী অগ্নি-বর্ষণ, সেই যে ভীষণ প্রলয়োচ্ছ্বাস, সেই যে বিষম ঝটিকা-প্রবাহ,—এ সকলই মনুষ্যের শুভোদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে। সেই সর্ব্বলোকহিতকর, সর্ব্ব-সুহৃৎ ভগবান—তিনি সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন। কি সেই সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক, কি সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব, কি সেই মলয়-

মারুতবাহী সুগন্ধি কুসুম-সৌরভ, কি সেই বিষম ঝটিকা-কালীন পবনান্দোলন, ভাবিতে গেলে—বুঝিতে গেলে, সকলই আমাদিগের মঙ্গলের জন্য।

ঐ—ঐ যে আমার অন্ধের যষ্টি একমাত্র পুত্ররত্ন আমার কঠোর ক্রোড়োপরি মস্তক রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে; ঐ—ঐ যে আমার গৃহলক্ষ্মী—আমায় আঁধার ঘরে ফেলিয়া অকালে অন্তর্দ্ধান হইতেছে; আমি বুঝি বা না বুঝি, কিন্তু সবই আমার মঙ্গলের জন্য। এইরূপ, আজি এই দারুণ মহামারী, কাল সেই দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল বদন-ব্যাদান, পরশ্বের অভাবনীয় অচিন্তানীয় অগ্নিবৃষ্টি—দেখিতে, শুনিতে, প্রথম দৃশ্যে যাহা কিছু ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ ও অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, তাহার সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য। কি ভাল, কি মন্দ, কি সু, কি কু,—ভগবান, কিছুতেই জীবের অমঙ্গলের অঙ্কপাত করিয়া রাখেন নাই। পরমপিতার পবিত্র রাজত্বে, ভাবিতে গেলে—বুঝিতে পারিলে, মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুতেই নাই। সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময়ের সর্ব্ব-কার্য্যই মঙ্গলালয়।

এ জগতে এ তত্ত্ব যে বুঝিয়াছে, সেই ধন্য! যে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভগবান যাহা করেন, তাহার সকলই মানবের মঙ্গলের জন্য, সেই এ জগতে ধন্য—সেই এ জগতে মহাপুরুষ! তাহার গতিমুক্তি, ভগবান আপনিই করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু হায়! ভ্রান্ত আমরা—সে তত্ত্ব আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, সে ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও হৃদয়ে রাখিতে পারি না। আমাদের মায়া-মরীচিকা-মুগ্ধ ভ্রান্ত মন, এতই বিপথগামী যে, কিছুতেই সে পথে—সে বিশ্বাসে আগুয়ান হইতে পারে না।

.সে স্বর্গীয় বিশ্বাস—সে অমৃতপ্রদ আত্মনির্ভর-শক্তি ক্ষীণপ্রাণ কীটাণু-কীট অধম আমরা—আমাদের থাকিবে, কোথা হইতে? দয়াল ভগবান, দয়া করিয়া, তুমি স্বয়ং যদি আমাদের হৃদয়ে সে বিশ্বাস-শক্তি না দিবে, তবে আমাদের এ চঞ্চল প্রাণে কোথা হইতে তাহার পবিত্র চিত্র অঙ্কিত হইবে? যেমন নিত্য নিত্য সে চিত্র চক্ষের উপর তুমি ধরিয়া আছ, তেমনই পিতঃ, আমাদের হৃদয়ে সেই শক্তি-সামর্থ্য একবার প্রদান কর না কেন, যাহাতে আমরা তাহার ধারণা করিতে সমর্থ হই।

ঐ—ঐ তো সেই চিত্র—ঈশ্বর মঙ্গলময়! ঐ—ঐ তো দেখিলাম,—ঈশ্বর মঙ্গলময়! কিন্তু কৈ?—কৈ, কোথায় লুকাইল? একি ঘনছায়ে বিজলী-লীলা—একি তরঙ্গ-রঙ্গে বুদ্বুদ-বিভ্রম! লীলাময়!—একি তোমার বিচিত্র লীলা—মনে সামান্য মাত্র ধারণা-শক্তিও কেন দিলে না, প্রভু! তাহলেও যে দয়াময়, উদ্ধারের অনেকটা উপায় করিয়া লইতে পারিতাম।

কত দৃশ্যই দেখি—ঈশ্বর মঙ্গলময়; কত দিকেই দেখি—ঈশ্বর মঙ্গলালয়। আকাশে দেখি, চন্দ্রে দেখি, সূর্য্যে দেখি, তারকায় দেখি—সর্ব্বত্রই ঈশ্বর মঙ্গলময়! কিবা চরাচর-মরুদ্ব্যোম, কিবা জল-স্থল-মহারণ্য—সর্ব্বত্রই ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু, হায়, আমার এ দগ্ধ-প্রাণে—আমার এ সন্তাপাবৃত হৃদয়ারণ্যে—কৈ তিনি—কৈ তাঁর সে মঙ্গলময় মূর্ত্তি! পাপীর আশ্রয় ভীষণ নরক-কুণ্ড—সেখানেও তো তাঁর সে মূর্ত্তি আছে? কিন্তু, হায়, আমার হৃদয়-নরক—এ কি সে নরক হইতেও হেয় যে, এখানে তাঁর স্থান হয় না! ভগবান! এ মনোক্ষোভ একবার মিটাও, প্রভু!

'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এ দৃশ্য তো জগতের প্রতিগৃহেই বিরাজমান। আজ এক ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি ও তাঁহার গুরুদেবের চিত্রে আর একবারও সে দৃশ্য দেখা যাউক। দেখিতে দেখিতে, শিখিতে শিখিতে, যদি বা কখনও তাহা, মনে অঙ্কিত হইয়া যায়।

পরম-ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতির কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। রাজা, রাজ-পারিষদগণ, রাজ্যের সমগ্র প্রজামণ্ডলী, সকলেই বিষাদ-মগ্ন; রাজ-মহিষীও নিশিদিন বিরলে অশ্রুপাত করেন।

তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেব, এত করিয়া বুঝাইয়া, বলেন,—"বৎস! কেন উতলা হও? ঈশ্বর মঙ্গলময়; তিনি যাহা করিতেছেন, সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য। তোমার যে সন্তান-সন্ততি হইতেছে না—এও তোমারই মঙ্গলের জন্য। সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইহাই বোধ হয় অভিপ্রেত। তুমি এখনও স্থির হও—এখন তাঁহাতে আত্মনির্ভর কর—এখনও বোঝ,—ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

কিন্তু, মানব-স্বভাব-সুলভ নৃপতির মন, সে প্রবোধ মানিবে কেন? নৃপতি, ক্রমেই, পুত্র-লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। রাজপুরেও দিন দিন দারুণ দুর্ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত হইল।

এইরূপেই বহু বর্ষ কাটিয়া গেল। ক্রমে কি অভাবনীয় কাল-পরিবর্ত্তন, নৃপতির এতদিনের আকাঙ্ক্ষার ফল ফলিল। এত কালের পর, বৃদ্ধ বয়সে, নৃপতি, এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের কি রূপ—কি মধুরিমা!—দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, স্বয়ং কন্দর্পই যেন নৃপতির পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

এখন, চারিদিকে আনন্দোৎসব। নৃপতির মনে আর আনন্দ ধরে না; রাজ-মহিষীরও এখন সকল বিষাদ দূর হইয়াছে। রাজ-পারিষদগণ, প্রজাবর্গ—আহা, তাহাদেরই বা আনন্দ দেখে কে? গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব—নগরে নগরে নর-নারীর আনন্দ-গান।

কিন্তু এ কি?—এ কি শুনি,—

'চিরদিন কভু সমান না যায়।'

এই হাসি, এই কান্না; এই আনন্দ, এই বিষাদ;—এ কি জগতের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত? এর কি আর কখনও ব্যতিক্রম নাই? হাসিলেই কাঁদিতে হইবে, কান্নার পরই ক্ষণিক হাসি, আবার কান্না;—সর্ব্বনিয়ন্তার এ কি অলঙ্ঘনীয় বিধি! এ বিধি-চক্র হইতে কাহারও কি আর নিষ্কৃতি নাই? ক্ষণিক সেই আনন্দের মধ্যে, নৃপতি, আবার এক নিদারুণ বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত লালন-পালন করিয়া, অহো—কি দুর্দ্দৈব, তাঁহার সেই আনন্দ-বর্দ্ধন পুত্ররত্নকে তিনি অকালে কালগ্রাসে প্রদান করিলেন।

আবার রাজ্যের সেই বিষণ্ণ ভাব!—আবার রাজপুরী শোকাচ্ছন্ন! রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই বক্ষ অশ্রু-জলাভিষিক্ত—সকলেরই মুখে সেই নিদারুণ হাহাকার-রব! হায়! পূর্ব্বের সে দৃশ্য—সে যে এর চেয়ে ভাল ছিল! বিধি, না দিতেন—সে বরং ছিল ভাল; কিন্তু, দিয়া কেন কাড়িয়া লইলেন?—কেন সে কনক-ছবি ঘন তিমিরে আবরিল! পাঁচ বৎসর স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করিয়া—পাঁচ বৎসর হৃদয়ের স্তরে স্তরে মায়া-মমতা অঙ্কিত করিয়া, নৃপতির বৃদ্ধ-বয়সের

এত সাধের প্রাণ-পুত্র কোথায় লুকাইল? এ দৃশ্য কি দেখিতে পারা যায়? এ অসহ্য যন্ত্রণা প্রাণে কি সহিতে পারা যায়?

কিন্তু, সেই তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেব, তিনি তখনও নৃপতিকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"বৎস! কিছুতেই বিচলিত হইও না। সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর—তিনি যাহা কিছু করেন, সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য। তিনি যখন তোমার পুত্ররত্নকে হরণ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহা শুভ-উদ্দেশ্যে—তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। বৎস! ঈশ্বর মঙ্গলময় জানিয়া, তুমি শোক-সন্তাপ বিস্মৃত হও; তাঁহাতে আত্ম-নির্ভর কর—তোমার মঙ্গল হইবে।"

কিন্তু, পিতার প্রাণ তাহা বুঝিবে কেন? কত আরাধনার পর, বহু-ভাগ্য-ফলে, এ নিদারুণ বৃদ্ধ-বয়সে, তিনি এক পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। কি তাহার সুন্দর রূপ—কি তাহার কমনীয়-কোমল মধুর হাবভাব! সে ভাব কি আর বিস্মৃত হওয়া যায়? কোন্ পিতা আর, তেমন পুত্রে হারাইয়া, স্থিরচিত্ত থাকিতে পারেন? কাজেই, নৃপতির শোক আর কমে না—নৃপতির মন আর বুঝে না। গুরুদেব এত করিয়া বুঝান, এত করিয়া উপদেশ দেন; কিন্তু মন বুঝিবে কেন? নৃপতি, নিশিদিন হা-হুতাশে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের প্রবোধ—গুরুদেবের অমৃতময় উপদেশ—কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তিপ্রদান করিল না; বরং তাহাতে, দিন দিন, তাঁহাকে অধিকতর বিরক্তি-প্রদান করিতে লাগিল।

পরিবর্ত্তনশীল সংসার-চক্রের আর এক চক্র-বিবর্ত্তন। আবার রাজপুরীর সে বিষাদময় দৃশ্য অন্তর্হিত হইল; আবার সকলে

আনন্দ-স্রোতে ভাসমান হইলেন; নৃপতি আবার এক নবকুমার লাভ করিলেন। নব-রাজকুমারের কি সুদৃঢ় গঠনাকৃতি—কি রাজোচিত তেজস্বিতা! কমল-কোরক কৈশোর বয়স হইতেই তাহার ঈদৃশ গুণগরিমায়, নৃপতি, আপনাকে বড়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; মনে মনে বুঝিলেন,—"এই পুত্রই পূর্ব্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিবে। রাজকার্য্যে যেমন তেজস্বিতা, যেমন উগ্রস্বভাব, যেমন সুদৃঢ় মূর্ত্তি আবশ্যক, পুত্র আমার ঠিক তদনুরূপই জন্মিয়াছে। এই হইতেই ঠিক আমার রাজ্য-রক্ষা হইবে।"

কিন্তু এ কি?—এ কি! নৃপতি সকলই কি আকাশ-কুসুম দেখিতেছেন? কৈ—কৈ, তাঁর এ পুত্রও তো কালের অকাল-গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইল না? প্রথম রাজকুমারের ন্যায়, এও যে পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই জীবলীলা সাঙ্গ করিল! আবার নৃপতির যে হাহাকার, সেই হাহাকার; আবার রাজপুরী সেই বিষাদ-মেঘাবৃত!

গুরুদেব, আবারও নৃপতিকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"বৎস! ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, এখনও মনে কর—সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুতেই অমঙ্গল নাই। মঙ্গলালয় ঈশ্বর—তাঁহার সকল কার্য্যেই জীবের মঙ্গল। তাই বলি, বৎস, এখনও বল—ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

নৃপতি, হতাশ-স্বরে একবার বলিলেন,—"ঈশ্বর মঙ্গলময়।

কিন্তু, তখনও সম্পূর্ণরূপে সে ধারণা যেন তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না। কি জানি কোন্ অলক্ষ্য মায়া-

মরিচিকায় আবার তাঁহার মন-মৃগকে বিপথে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে আরও কত দিন, কত বর্ষ, কাটিয়া গেল। বারবার আবারও পরীক্ষা—পরীক্ষার উপর পরীক্ষা! একবার, দুইবার, তিনবার—তাহাতেও নিবৃত্তি নাই!—বারবার ছয় বার, নৃপতির উপর দিয়া, এইরূপ পরীক্ষা-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। নৃপতিও, ক্রমশঃ পুত্রশোকানলে জরজর হইতে লাগিলেন।

যেখানে অধিক মনোভঙ্গ, সেইখানেই অনুতাপ। পরম পিতার কি এক পবিত্র নিয়ম, সেইখানেই তিনি তাঁহার সেই শান্তিময় হস্তপ্রসারণে আমাদিগকে অভয়-প্রদান করেন,—"ভয় নাই—ভয় নাই।" শোকে, বিষাদে, মনোভঙ্গে, তাঁহার সে আশ্বাস-বাণী, আহা, কি শান্তিপ্রদ—কি মধুরিমাময়! বাস্তবিকই দারুণ কষ্টের সময়, মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তিনি যদি আমাদিগকে এমন আশ্বাস-বাণী প্রদান না করিতেন—সে সময়েও যদি মানুষের মনে তাঁহার সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য গুণ-মাধুরী উদয় না হইত; বাস্তবিকই তখনও যদি আমরা তাঁহাকে না ডাকিতে পাইতাম; তবে কি আর আমরা দারুণ মনোকষ্ট হইতে কখনও পরিত্রাণ পাইতাম? তাহা হইলে, বোধ হয়, সেইখানেই আমাদের সকল সুখাশার অন্ত হইত। কিন্তু, কি তাঁহার অচিন্ত্য পুত্র-বাৎসল্য যে, মনে কোনরূপ কষ্টের উদয় হইলেই—আপনা-আপনিই তাঁহার সেই শান্তিময় শুভ-মূর্ত্তি আমাদের মনোমধ্যে আসিয়া উদিত হয়; তাঁহার চিন্তায়, সে নিদারুণ কষ্টের সময়ও, আমরা শান্তিসুখে সুখী হই। এ কি তাঁর অচিন্ত্য মহিমা।

মনোকষ্টের পর মনোকষ্টে, দারুণ দুর্দ্দৈবের পর নিদারুণ নিরানন্দে, নৃপতির মনোমধ্যে ক্রমশঃই প্রগাঢ়রূপে ভগবচ্চিন্তার উদয় হওয়ায়, এখন অনেকটা তিনি সুদৃঢ়-চিত্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার গুরুদেবের সেই অমৃতময় উপদেশ, তাঁহার হৃদয়ে যেন এক অপূর্ব্ব অমৃত-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নৃপতি, এখন অনেকটা স্থিরচিত্ত—অনেকটা সহিষ্ণু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর, সেই সময়ই, নৃপতির শেষ-পুত্রের মৃত্যু ঘটিল; তাঁহার পূর্ব্বের পাঁচটি পুত্রের ন্যায়, ষষ্ঠ পুত্রটিও এইবার কাল-কবলে কবলিত হইল।

আবার গুরুদেব, নৃপতিকে সেই অমৃতময় বাণী শুনাইলেন,—"ঈশ্বর মঙ্গলময়।" এবার যেন নৃপতির হৃদ্-স্তরে আরও গভীরতররূপে সে শুভ-কথা খোদিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে, পাগলের প্রায়, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, গুরুদেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, আনন্দ-গদ্গদ-স্বরে বলিলেন,—"জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়! জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়!"

মনুষ্য যদি এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, তবে আর তাহার ভাবনা কি? এত উদ্বেগ-প্রবাহ, এত শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াও, সে যদি সেই অনন্তের দিকে আগুয়ান হইতে পারে; তবে আর তাহার পারের চিন্তা কি? যে এতদূর সহিয়াছে—সহিতে সহিতে, যাহার মনে সেই উচ্চতম ভাবের অনুভূতি হইয়াছে; তাহার আর ভবের ভাবনা কি? তাহার আত্মা-অস্তিত্ব সকলই তো সেই সচ্চিদানন্দে মিলিত হইয়াছে! সে তখন সেই জ্যোতির্ম্ময়, শান্তিময়, আনন্দময়, ব্রহ্মের সমীপস্থ হইবার ক্ষমতা পাইয়াছে। এতদূরই পরীক্ষার ক্ষেত্র—

এতদূরেই সংসার-ক্লেশের অবসান হয়। ভক্ত সাধক, এতদূর অগ্রসর হইলেই মোক্ষ-পথ প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্বদর্শী, পরমজ্ঞানী গুরুদেব, এতদিনে বুঝিলেন,—নৃপতি বাস্তবিকই উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন। মনে মনে স্থির করিলেন,—"নৃপতিকে পথ-প্রদর্শন করিবার এই উপযুক্ত সময়। এখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, এখন তাঁহাকে সেই সচ্চিদানন্দ পরম-পুরুষের প্রতি অগ্রসর করাইলে, অবশ্যই তিনি উপায় পাইবেন।" সুতরাং এইবার গুরুদেব, নৃপতির চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিলেন। এতদূর পর্য্যন্ত কঠোর পরীক্ষার পর, এতক্ষণে শিষ্যকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন,—"দেখ, বৎস,— দেখ ঐ—ঐ

ঈশ্বর মঙ্গলময়!

এ কি স্বপ্ন?—এ কি ছায়াবাজী? নৃপতি দেখিলেন,—তাঁহার সেই গভীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সহসা জ্যোতিঃপুঞ্জের আবির্ভাব হইল; আর যেন সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ বিদীর্ণ করিয়া, তদপেক্ষাও এক অলন্ত হীরকোজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত হইল,—"ঈশ্বর মঙ্গলময়।" কিন্তু, তারপর?—তারপরই, তদুপরি, এক ভীষণ রঙ্গপট, তাঁহার নয়নপথ ঝলসাইয়া, উত্তোলিত হইল। নৃপতি অমনি চমকিয়া উঠিলেন; বিস্ময়ে, ভয়ে, বিষাদে, ক্ষোভে, তাঁহার হৃদয় যেন উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন,—

ঐ—ঐ যেন তাঁর সেই প্রথম পুত্র! সেই কন্দর্প-কান্তি, সুমনোহর রাজকুমার—ঐ—ঐ যেন পিশাচ-মূর্ত্তিতে সংসার-রঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া, বিকট রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কামুক,

কদাচারী, ব্যভিচার-দোষগ্রস্ত, নরপশু—অহো—কি তার তাণ্ডব নৃত্য! পাষণ্ড মূর্ত্তিমান বিকট কামাবতার—কামোন্মত্ত—হতভাগ্যের যেন মাতা-ভগ্নী-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত।

এ কি! আবার পট-পরিবর্ত্তন! নৃপতি, পর-দৃশ্যেই আবার দেখিলেন,—

ঐ—ঐ যেন তাঁর সেই দ্বিতীয় পুত্র!—যেন জলন্ত অগ্নি! উ-হু! কি উগ্র—কি অশিষ্ট—কি রৌদ্র! সে যেন উগ্রাবতার—রৌদ্রাবতার—ক্রোধাবতার! তাহার ক্রোধাগ্নিতে পড়িয়া, হায়, কতই নিরীহ জীবন ভস্মস্তূপে পরিণত হইতেছে! সে দৃশ্যে চারিদিকে হাহাকার—চারিদিকে হা-হুতাশ!

তার পর?—তার পর, আবার এক পট-পরিবর্ত্তন। তৃতীয় দৃশ্যে নৃপতি দেখিলেন,—

তাঁহার তৃতীয় পুত্র! একি!—এ আবার কি ভীষণ নরক-কুণ্ড! হতভাগ্য পুতিগন্ধময়, বিকট-মূর্ত্তি লোভাবতার! চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, ছদ্মবেশ, হতভাগ্যের যেন অঙ্গের ভূষণ হইয়া আসিয়াছে। কি বিকট!—কি ভীষণ!

নৃপতি, আর দেখিতে পারিলেন না। কিন্তু, আবারও—আবারও এ কি?—

চতুর্থ দৃশ্য! এ যে তাঁর চতুর্থ পুত্র! এই পিতার এমন পুত্র! কি গর্ব্বী, কি অহঙ্কারী, কি আত্মাভিমানী! হতভাগ্য, গর্ব্বভরে যেন, 'ধরাকে সরা'-সম জ্ঞান করিতেছে।

নৃপতি, আর সে দৃশ্য দেখিলেন না। তাঁহার চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, পরক্ষণেই, আবার এক পট-পরিবর্ত্তন! পঞ্চম দৃশ্যে নৃপতি দেখিলেন,—

তাঁহার পঞ্চম পুত্র! কি বিষম পরিণতি!—হতভাগ্যের কি পশুত্ব-প্রাপ্তি! অভাগা, মোহ-বশে, কি অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে! কি মোহ!—কি ভ্রম!

তৎপরেই শেষ-দৃশ্য! নৃপতি দেখিলেন,—তাঁহার সেই সর্ব্ব-শেষ ষষ্ঠ পুত্র শেষ-দৃশ্যে বিরাজমান। সে কি ঘোর মাৎসর্য্যাবতার! পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ হতভাগ্য, কেবল সেই পাপ-পঙ্কে ডুবিয়াই জীবন-যাপন করিতেছে। কি ভয়ানক—কি লোমহর্ষক!

নৃপতি, আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় যেন কি এক বিষম দহনে দহিতে লাগিল। সে দহন আর সহিতে না পারিয়া অজ্ঞান-অচৈতন্য-ভাবে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে, যেন রঙ্গক্ষেত্রের যবনিকা পতিত হইল। ক্ষণকাল চারিদিক নীরব—উদ্বেগশূন্য—স্তব্ধীভূত!

অতঃপর সেই পরম-জ্ঞান-স্বরূপ গুরুদেব, আর একবার সেই কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। আপনার পদ্মহস্ত-স্পর্শে নৃপতিকে সংজ্ঞাদান করিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! বুঝিলে?—বুঝিলে কি এতক্ষণে? বুঝিলে,—ঈশ্বর কেমন মঙ্গলময়?"

নৃপতি, গুরুদেবের চরণ-প্রান্তে নিপতিত হইয়া, বিনীতস্বরে বলিলেন,—"গুরুদেব! অজ্ঞান অধম আমি—আমায় ক্ষমা করুন। গুরুবাক্য অবহেলায় আমার যে পাপ হইয়াছে, প্রভু, এখন দয়া করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করিয়া দেন।"

গুরুদেব, ধীরগম্ভীর-স্বরে, বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! তবে শোন! আর তোমার কোনই ভাবনা নাই। তুমি যখন

পুত্ররূপী তোমার সেই ষড়রিপুকে দমন করিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমার ভাবনা কি? বৎস! সৎপুত্র হইতে যদিও কথঞ্চিৎ পিতৃকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সত্য; কিন্তু কুপুত্র, সর্ব্ব-বিষয়েই পিতার নরক-গমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বৎস! বোঝ দেখি এখন, ঈশ্বর যে তোমার পুত্রদিগকে অকালে কাল-কবলে নিপতিত করিয়াছিলেন, সে শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্য কি না? ভাব দেখি, তোমার সেই প্রথম পুত্র যদি এতদিন বাঁচিয়া থাকিত, তবে তোমার সংসারে কি ভয়ানক পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইত? সে হতভাগ্য যে পশুসম ঘোর কামাচারী হইত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম; আর তাই-ই, বৎস, তাহার মৃত্যুর পর, আনন্দ-প্রকাশ করিয়া তোমায় বলিয়াছিলাম,—'ভালই হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার ভালই করিলেন।' দেখ দেখি এখন, সে কথা ঠিক কি না? ভাব দেখি একবার, সে পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে তোমায় কোন্ নরক-কুণ্ডে পচিতে হইত? বৎস! সেরূপ পুত্র কি কখনও প্রার্থনীয়? তোমার অদৃষ্ট ভাল, তাই তোমার পুত্র অমন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এইরূপ, তোমার দ্বিতীয় পুত্র, বাঁচিয়া থাকিলে, ক্রোধাবতার হইত। সুতরাং সে পুত্রের মৃত্যুতেও বলিয়াছিলাম,—'ঈশ্বর মঙ্গলময়। তোমার মঙ্গলের জন্যই তিনি এমন করিলেন।' তার পর, অন্যান্য পুত্রদিগের কথাই বা আর বলিব কি?—নিজেই তো দেখিলে, তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে, কে কিরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত! তৃতীয় পুত্র লোভাবতার, চতুর্থ পুত্র মোহাবতার, পঞ্চম পুত্র মদাবতার, ষষ্ঠ পুত্র মাৎসর্য্যাবতার—এ সব পুত্র কি প্রার্থনীয়?"

নৃপতির ভগবদ্দত্ত চিত্তের চমক অনেকটা ভাঙ্গিল। গুরু-দেবের চরণ-প্রান্তে নিপতিত হইয়া, তিনি তখন আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুদেব! সবই তো বুঝিলাম। কিন্তু, তবুও মন হইতে একটি সংশয়কে দূর করিতে পারিতেছি না! সে সংশয়-প্রশ্নটি এই যে, মঙ্গলময় ঈশ্বর আমায় তো একটি সুপুত্র প্রদান করিতে পারিতেন? কিন্তু, তাহাই বা দিলেন না কেন?"

গুরুদেব ঈষদ্-হাস্যে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! তবে শোন! মনে কর, যদি তোমার কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিত; কিন্তু, তাহা হইলে, তুমি কি আর ধর্ম্মকর্ম্মে সম্যক মতিমান্ থাকিতে পারিতে? এখন যে এই দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ-বিমোচনার্থ, অনাহারীকে অন্নদান-জন্য, আতুর-ভিক্ষুককে পরিতুষ্ট করিতে, তোমার একান্ত যত্ন রহিয়াছে, ভাব দেখি বৎস, তখন তুমি তেমন পারিতে কি? এখন এই তোমার অতুল সম্পত্তি—তুমি অনায়াসেই সাধুকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছ; কিন্তু, যদি তোমার কোন সন্তান-সন্ততি থাকিত, তাহার মায়ায়—তাহার ভবিষ্য ভাবনা ভাবিয়া, তুমি কি এরূপ করিতে পারিতে? তখন তোমায় নিশ্চিতই ভাবিতে হইত—পুত্রের কি হইবে? আর ভাব দেখি বৎস, তা' হলে তোমার পরকালের কাজ কি হইত? কিন্তু দেখ, ঈশ্বর কেমন মঙ্গলময় —তিনি তোমার সে পথ আপনিই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই বলি, বৎস! বল—এখনও বল,—'জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিও ভক্তি-প্রণোদিত আনন্দ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

ভক্তের পূজাপদ্ধতি।

ভক্তের কার্য্য, অনুষ্ঠান-হীন ও আড়ম্বর-শূন্য। তিনি কার্য্যে কখনও প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাঁহার আচমন-আবাহন কি প্রকার! দীর্ঘ-জটাজুট-শ্মশ্রুধারী, চীর-কৌপীন-পরিহিত ঐ যে ভস্মবিলেপিত-অঙ্গ সন্ন্যাসী, "ব্যোম ব্যোম হরে হরে" শব্দে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া চলিয়াছেন, অথবা ঐ যে মুণ্ডিত-মুণ্ড, হরিনামাঙ্কিত-বপু, সর্ব্বথা হরিনাম-জপরত বৃদ্ধ,—প্রকৃত ভক্তের মহিমা বুঝি বা উঁহাদের কাহাতেও নাই! ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই, তরঙ্গ নাই—তাহা অচঞ্চল, প্রশান্ত—সদাই অন্তঃশীলা বহিয়া থাকে। বহিশ্চক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—সাধারণ-কর্ণে ভক্তের আবাহন চির-অশ্রুত রহিয়া যায়। আমরা যে চক্ষে, যে ভাবে, যাঁহাকে ভক্ত বলিয়া দেখি, বুঝি বা, আমাদের সে চক্ষের সে দৃষ্টি চির-ভ্রান্ত!—আমরা ভ্রান্তিবশে বিপথে যাইয়া প্রতারিত!

কিরূপে ভ্রান্ত, কিরূপে প্রতারিত, যদিও সে দৃশ্য নিত্য নিত্যই দেখিতে পাই, কিন্তু এই ক্ষোভ যে, এপর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে শিখিলাম না—মনে মনে সে দৃশ্য কৈ আসিয়াও তো জাগে না! আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—এ ভাব অনেক সময় অনেক সাধক-শ্রেষ্ঠ দেব-চরিত্র মহাত্মাই বুঝিতে পারেন নাই। হরি-পরায়ণ অদ্বিতীয় ভক্ত মহর্ষি নারদও একদিন, এ ভাব না বুঝিতে পারিয়া, বড়ই ক্ষোভে বলিয়াছিলেন,—"লীলাময়! তোমার লীলা, অধম আমি, কি বুঝিব!"

মহর্ষি নারদ একদিন বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়াই দেখিলেন; নারায়ণের আবাস-মন্দিরের পার্শ্বেই এক সুন্দরতর মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালী এত সুন্দর যে, তাহা দেখিয়াই মহর্ষি বুঝিলেন,—'নিশ্চিতই নারায়ণ পূর্ব্বমন্দির ত্যাগ করিয়া এখন হইতে এই নূতন মন্দিরে বাস করিবেন।' এইরূপ বুঝিয়াই, একবার নারায়ণ-সমীপে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে, তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। ভাবিলেন,—"হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি! প্রাচীন মন্দিরে এখনও তো সম্পূর্ণ নূতনত্ব বর্ত্তমান; তথাপি হঠাৎ তিনি কেন এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইয়া; নারায়ণের চরণার্চ্চনার পরই, মহর্ষি, অভিবাদন-পূর্ব্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু! আপনার মন্দির-সংলগ্ন ঐ যে নব-রচিত সুন্দর মন্দিরটি দেখিতেছি, আপনি কি এখন হইতে ঐ মন্দিরেই বাস করিবেন? হঠাৎ আপনার এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি?"

নারায়ণ সস্নেহে উত্তর করিলেন,—"না না নারদ—আমার জন্য নহে। ও মন্দির, আমি বাস করিব বলিয়া প্রস্তুত হয় নাই। আমার এক পরম ভক্ত কৃষক—মনে করিয়াছি, তাহাকেই এইখানে আনিয়া রাখিব। তাহার সেই অপূর্ব্ব ভক্তি দেখিয়া তাহার নিকট হইতে অপরিমেয় প্রেম পাইয়া, নারদ, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনে করিয়াছি, তাহাকে আমার যোগ্যাসনেই স্থান দিব। তাহার মুখে মধুর হরিনাম শুনিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব।"

নারায়ণের উত্তর শুনিয়াই, মহর্ষি চমকিত হইলেন। সে কথা তাঁহার মনেই যেন স্থান পাইতে পারিল না। তিনি ভাবিলেন,—"এ বোধ হয় ঠাকুরের ভ্রান্তি। নহিলে, মর্ত্তে এমন ভক্ত কে আছে যে, তাঁহার তুল্যাসনে স্থান পায়? এই আমরা সর্ব্বত্যাগী—সদাই হরিনাম-জপে নিমগ্ন। কিন্তু কৈ, ঠাকুর তো এমন একদিনও বলিলেন না,—'নারদ! তোমার জন্য এই কার্য্য করিতেছি।' যাইহোক, আমাকে একবার, দেখিতে হইতেছে, সে ভক্ত কে?—দেখিব একবার, তাহার ভক্তি আমাদের ভক্তি অপেক্ষাও কত উচ্চ!" এইরূপ ভাবিয়াই, মহর্ষি, আর একবারও প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, দয়াময়, আপনার সে ভক্ত থাকেন কোথায়?—তাঁহার পরিচয় কি?"

ভগবান তখন সেই ভক্তের পরিচয় মহর্ষিকে প্রদান করিলেন; তাঁহার সেই ভক্ত কৃষক, কোন্ গ্রামে, কোন্ স্থানে বসতি করেন, নারদ সকলই শুনিলেন। শুনিয়াই, মহর্ষি আর বৈকুণ্ঠে রহিলেন না—পুনরভিবাদনপূর্ব্বক, নারায়ণকে প্রণাম করিয়াই, তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বাসনা, একবার দেখিবেন, সে ভক্তের ভক্তি কিরূপ—সে কিরূপ 'পূজা-পদ্ধতি' শিক্ষা করিয়া ভগবানকে মোহিত করিয়াছে!

... ...

পূর্ব্বদিক নবরাগে রঞ্জিত। অরুণ-কিরণচ্ছটা ধীরে-ধীরে পত্রে-পত্রে শাখায়-শাখায় হেলিয়া-দুলিয়া মাখিয়া যাইতেছে। প্রভাতী পাখী, সে শোভা দেখিয়া, মোহিত হইয়া, আপন প্রণয়ি-প্রণয়িনীকে আবার সে সুখভাগী করিতে, মধুর নিক্বণে আবাহন করিতেছে। দেখিতে, শুনিতে, এমন তৃপ্তিপ্রদ

দৃশ্য বুঝি বা আর নাই! সংসার-নাট্যশালার এই মধুর দৃশ্য কি চমৎকার!

মহর্ষি নারদ, এই মধুর ঊষা-সমাগমে আপন আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার পর হইতে আরম্ভ করিয়া, সন্ধ্যার পর পুনরায় শয্যায় শয়ন করিবার সময় পর্য্যন্ত, তিনি নিভৃতে সেই কৃষকের কার্য্যানুষ্ঠান দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, দেখিতে দেখিতে, কাটিয়া গেল। কিন্তু মহর্ষি নারদ, বিন্দু-পরিমাণেও তাহাতে প্রমাণ পাইলেন না যে, সে কৃষক অণুমাত্রও ভগবদ্ভক্ত কি না! তিনি দিনান্তে একবারও দেখিতে পাইলেন না যে, কৃষক ভ্রমেও কখনও হরিনাম জপ করিতেছে। তিনি এইমাত্র দেখিলেন,—কৃষক প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই আপন কৃষাণগণে লইয়া মাঠে হলচালনা করিতে যায়; স্নানাহারও তাহার সেই মাঠে মাঠে। তারপর, দ্বিপ্রহরে মাঠ হইতে ফিরিয়া, সে হাটে হাট-বাজার করিতে যায়; হাট-বাজার করিয়া ফিরিয়া, কৃষাণ-মজুরদিগের হিসাব-পত্র পরিষ্কার-করণ, দেনা-পত্রের আদান-প্রদান, পরদিনে কিরূপ কি হইবে, তাহার কার্য্য-ভাগ প্রভৃতি কার্য্যে, সে ব্যস্ত থাকে। ফলতঃ মহর্ষি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিলেন না,—কৃষক, ভ্রমেও একবার হরিনাম জপ করিতেছে।

তিন দিন মহর্ষির এইরূপে অতিবাহিত হইল। তখন তাঁহার মন, সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—'নারায়ণ নিশ্চিতই ভ্রান্ত হইয়াছেন। নহিলে, যে ব্যক্তি দিনান্তে একবারও তাঁহার পূজা করে না, সেই তাঁহার পরম ভক্ত হইবে কেন?' যাইহোক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই

আরও দুই তিন দিন মাত্র দেখিয়াই ভগবৎ-সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইবেন, অতঃপর মহর্ষির এইরূপ বাসনা জন্মিল। এখন, তিনি আরও কিছুদিন দিবারাত্রি প্রতীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কৃষক কি করে! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, বরাবরই কৃষকের সেই একই ভাব! তবে বেশীর ভাগ এইটুকু-মাত্র মহর্ষি সে কয়দিনে দেখিলেন,—সন্ধ্যার পর, শয়নের সময়, কৃষক একবার এইমাত্র বলে,—"হরি হে, পার কর।" ইহা ভিন্ন, আর কোন মুহূর্ত্তে, তিনি কৃষকের মুখে হরি-নাম শুনিতে পাইলেন না। সুতরাং ক্রমে তাঁহার সে সন্দেহ সত্য বলিয়াই ধারণা হইল। তিনি তখন, সদম্ভে একবার ভগবানের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার ভ্রম দেখাইতে সোৎসুক হইলেন।

... ...

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহর। মধুর অরুণ এখন প্রখর মার্ত্তণ্ডদেব। চতুর্দ্দিক তাপদগ্ধ। সেই পাখী, প্রভাতে যে তখন নবারুণ-আগমনে প্রিয়জনে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তাহার মুখে এখন—"পালাও, পালাও।" সে যেন এখন আপনার আত্মীয়স্বজনকে দূরে পলাইয়া বাঁচিতে বলিতেছে। স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে, এই প্রখর রৌদ্রতাপে অবহেলা করিয়া, মহর্ষি, বীণা-বাদন করিতে করিতে, ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইলেন; এবং ভক্তি-ভরে তাঁহার চরণার্চ্চনান্তর, করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"দেব! আপনি প্রকৃতই ভ্রমে পড়িয়াছেন। আপনি যাহাকে পরম ভক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, দেখিলাম, সে পরম অধার্ম্মিক—সে ভুলিয়াও একবার আপনার নাম করে না। তবে দেব! এ কেমন আপনার মহিমা যে, আপনি বলিতেছেন, সে আপনার

এক অদ্বিতীয় ভক্ত ? এ কি দেব, আমার সহিত ছলনা করিতে-ছেন ? আপনার প্রতি আমার ভক্তির কি কিছু ত্রুটি হইয়াছে !"

ভগবান তখন, স্নেহ-সম্ভাষে, নারদকে বলিলেন,—"নারদ! আমি ভ্রমে পড়ি নাই। আচ্ছা, এখন থাক; পরে তোমাকে আমি বুঝাইব, সে আমার কতদূর ভক্ত।" এই বলিয়াই, ভগবান তখন, কি যেন কি স্মরণ করিয়া লইলেন এই ভাব দেখাইয়া, নারদকে বলিলেন,—"নারদ! তাই তো, তোমার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি তো বড় এক কাজ ভুলিয়া গিয়াছি! আমার একজন ভক্ত, ঐ নূতন মন্দিরে, আমার জন্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন! তা' যাইহোক, তুমি যদি সেই দুগ্ধ-ভাণ্ড এখন এখানে লইয়া আইস, তবে বড় ভাল হয়। নারদ, আমি বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি।"

ভগবদ্গত-প্রাণ নারদ, ভগবানের এ আদেশে কি আর বিলম্ব করিতে পারেন ? ভগবানের আদেশমাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নূতন মন্দিরে গমন করিলেন; এবং সত্বর সেই দুগ্ধভাণ্ড আনয়নে তৎপর হইলেন।

কিন্তু তাহা আনয়ন বড়ই অসাধ্য হইল। মহর্ষি দেখিলেন, দুগ্ধে ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ—হাতে তুলিলেই ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে; কিন্তু উপায়ান্তর নাই!—না লইয়া যাইলেই চলিবে না! বিশেষতঃ ভগবান বড়ই ক্ষুধিত হইয়া যখন আদেশ করিয়াছেন! সুতরাং মহর্ষি তখন অতি সন্তর্পণে সেই ভাণ্ডটিকে হস্তে উত্তোলন করিলেন; এবং দুই হস্তে উহা ধারণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কেবল দৃষ্টি রহিল, যেন দুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া না

পড়ে। এইরূপে, অতি যত্নে, নিমেষ-সময় প্রহরে অতিবাহিত করিয়া, ধীরে ধীরে, তিনি নারায়ণের নিকট আগমন করিলেন; আসিয়াই, তাঁহাকে বলিলেন,—"একে ক্ষুদ্রভাণ্ড, তা'য় দুগ্ধে পরিপূর্ণ। বড়ই কষ্টে আনিতে হইয়াছে। বিলম্ব হইয়াছে; কি করিব! ক্ষমা করুন।"

নারদের এইরূপ কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র ক্লেশ না দেখাইয়া, ভগবান তখন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,— "নারদ! আচ্ছা বল দেখি, এই যে সময়টি তুমি দুগ্ধ-আনয়নে অতিবাহিত করিয়াছ, ইহার মধ্যে ভ্রমেও কি তুমি একবার হরিনাম জপ করিতে পারিয়াছ?"

নারদ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর! এ কি বলেন? আমি যদি দুগ্ধভাণ্ড লইয়া আসিবার সময় হরিনামে মন দিতাম, তবে কি এতখানিও দুগ্ধ আনিতে পারিতাম! তাহা হইলে নিশ্চিতই যে উহা সমস্তই উছলিয়া পড়িত! সেরূপ করিলে, আপনি বোধ হয়, এক বিন্দুও দুগ্ধ পাইতেন না!"

ভগবান তখন, আপনার পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া, মহর্ষিকে দিব্য-চক্ষু প্রদান-পূর্ব্বক, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,— "নারদ!—নারদ! দেখিলে—দেখিলে! এইবার একবার ভাব দেখি, ভক্তের পূজা-পদ্ধতি কিরূপ অসামান্য! সামান্য এক ভাণ্ড দুগ্ধের ভার লইয়া যখন তুমি অস্থির হইলে; এত যে তুমি ভগবদ্ভক্ত, তবুও এতখানি সময় পর্য্যন্ত যখন একবারও হরিনাম করিতে তোমার অবকাশ হইল না; তখন একবার ভাব দেখি,—কঠোর সংসার-ভার-প্রপীড়িত, বহু-পরিবারের প্রতিপালন-ভারে অস্থিচর্ম্মসার, অন্নের ভিখারী সেই দরিদ্র

কৃষক, কি করিয়া কেবলই আমায় ডাকিবে? বিন্দু-পরিমাণ দুগ্ধের ভার প্রদান করায় তুমি হেন আমার প্রধান ভক্ত যখন আমায় বিস্মিত হইতে পারিলে; তখন, বল-বল, বল দেখি, এত গুরু-ভার তাহার মস্তকে রাখাতেও সে যে আমায় একেবারেই ভোলে নাই, এই কি আশ্চর্য্য নহে? নারদ! তুমি এত জ্ঞানী, এত ভক্ত; তবুও তুমি আমার সে ভক্তকে চিনিতে পারিলে না! সে যে সেই দিনান্তে একবার "হরি হে, আমায় পার কর" বলিয়া ডাকে, সেই-ই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? তাহার সে প্রাণের ডাক শুনিয়া—তাহার সে সভক্তি ক্রন্দনে, বল দেখি, মন বিগলিত হয় কি না? তোমাদের সময় আছে, সামর্থ্য আছে, উপায় আছে; তবুও তোমরা এক-একবার আমায় ভুলিয়া যাও; কিন্তু, আহা সে!—সে তো কৈ এত যন্ত্রণা পাইয়াও আমায় ভোলে নাই! নারদ! তুমি কি জান না, এই প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াও—প্রলোভনে না মজিয়া—অচঞ্চল-স্থিরভাবে যে আমায় একবারও ডাকিবার সময় করিয়া লয়, সেই কি ধন্য নহে? নারদ! আরও, তুমি কি জান না যে, মুখের ডাকা, ডাকা নহে, প্রাণের ডাকাই ডাকা! বাহ্য আবরণ ভক্তের পরিচায়ক যদি হইত, তবে কি নারদ, এত যোগী-সন্ন্যাসী থাকিতে ঐ লোকঘৃণ্য কৃষক আমার আদরের পাত্র হইতে পারিত? তাই আবারও বলি, নারদ! সংসারের এত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও, এত গুরুভার-বহনের ক্লেশ সহিয়াও, যিনি অচঞ্চল—উদ্বেগ-শূন্য, অথচ আমার ভক্ত, তিনিই আমার কৃপার পাত্র। নারদ! জানিও, 'ভক্তের পূজা-পদ্ধতি' কিছুই নাই। বাহ্য আবরণে কেহ ভক্ত হইতে পারে না।"

ভগবানের এই উপদেশ শুনিয়া, মহর্ষির চমক ভাঙ্গিল। তিনি, অনুতপ্ত-হৃদয়ে, শ্রীহরির শ্রীচরণে পতিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"লীলাময়, অধম আমি, আপনার লীলার মহিমা আমি কি বুঝিব?"

পুণ্যবানের পরীক্ষা।

এ জগতে প্রকৃত পুণ্যাত্মা কে? ঐ যে সন্ন্যাসী—যাঁহার পাদোদক-পানে অন্যে আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিতেছে—নিয়তই যাঁহার মুখে "ব্যোম ব্যোম হরে হরে" শব্দ—উনিই কি তবে প্রকৃত পুণ্যাত্মা! অঙ্গে হরিনাম-লেখা, গাত্রে হরি-নামাবলী, পরিধানে জীর্ণ কৌপিন, মুখে সদাই 'হরি হরি'—তবে এই সকলই কি পুণ্যাত্মার লক্ষণ? অথবা, নৈয়ায়িক, পণ্ডিত, শাস্ত্রপাঠী, ধনবান, কিম্বা কুলগুরু আচার্য্য হইলেই কি পুণ্যাত্মা হওয়া যায়? আর, ঐ চিরদরিদ্র, অন্নের কাঙ্গালী, দিনান্তে একবার আহার করিয়া যাহার স্ত্রীপুত্র জীবন-ধারণ করে, তবে তাহারাই কি কেবল একমাত্র পাপী? মূর্খ হইলেই, অজ্ঞান থাকিলেই, শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারিলেই, বুঝি আর পুণ্যাত্মা হওয়া যায় না! জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক না পাইলে, বড়লোক—মহৎ ব্যক্তি বলিয়া নাম কিনিতে না পারিলে, পাঁচ জনে আমায় 'পুণ্যাত্মা ব্যক্তি' বলিয়া সম্ভাষণ না করিলে, তবে বুঝি, আর উদ্ধারের উপায়ই নাই! পুণ্যক্ষেত্রে মরিতে পারিলেই, তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিলেই,

দেবদেবীর কৃত্রিম মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলেই, অথবা গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই, বুঝি আর মোক্ষের ভাবনা থাকে না! যে তাহা না করিতে পারে—যাহার সময়, অবস্থা বা অনাটনে তাহার সকলগুলি না কুলায়, সেই তবে নরকস্থ হইবার পাত্র? হায়-হায়! কলির পৃথিবী এতই অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু, বাস্তবিকই কি তাই? কলির লোকের বিশ্বাস-ধারণা এইরূপ হউক; কিন্তু, তাই বলিয়া, প্রকৃতই কি ঈশ্বরের রাজ্যের এই বিচার? কখনই না। লোকের যাহা ধারণা থাকে, থাকুক; যে ভাবনা ভাবিয়া লোকে কার্য্য করে, করুক; কিন্তু সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের কার্য্য চিরদিনই একরূপ আছে। তাঁহার কার্য্যের কথনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর কি সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার বিধি-বিধান নির্ভর করে? তাঁহার বিধান আবহমান-কাল যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেরূপই আছে; চিরদিন থাকিবেও সেইরূপ। তবে বৃথা আমাদের ভাবনা—অনর্থক আমরা পাপপুণ্যের ভেদাভেদ স্থির করিয়া লই। তাঁহার সে বিধান কিরূপ, সেই উপলক্ষে, কোন সাধক একদিন একটি গল্প করিয়াছিলেন। সে গল্পটি বড়ই মনোরম, বড়ই উপদেশক—তাহার সত্য বড়ই সুন্দর প্রস্ফুটিত! পাঠক, দেখুন, এ প্রবন্ধ-সূচনায় সে গল্পটিই বেস খাটিতেছে।

শ্রীশ্রী৺ কাশীধাম। মণিকর্ণিকার ঘাট। দশহারার স্নান-উপলক্ষ। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে লোক আর ধরে না। একে দশহারা, তায় আবার কি এক মহাযোগ উপস্থিত! দেশ-দেশান্তর হইতে, নগর-গ্রামাভ্যন্তর হইতে, মণিকর্ণিকা লোকে লোকারণ্য! বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, সাধু-উদাসী, ফকির-মহাজন,

স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই স্নান-পূজায় নিমগ্ন। সকলেরই মুখে,—"মাতর্গঙ্গে"; সকলেই বলিতেছে,—"পতিতুদ্ধারিণী মা!" দান, ধ্যান, তপ, জপ, পূজা, মন্ত্রপাঠ, আচমন, আবাহনে চতুর্দিক পরিপূর্ণ; দশহারায় দশজন্মের পাপক্ষয় হইতেছে,—এই আহ্লাদেই সকলে আটখানা।

এই সময়, পতি-পার্শ্বে বসিয়া, পার্ব্বতী, মহাযোগী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু! আজ আমার মনে একটি বড়ই সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত। যখন যাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তখনই আমায় সস্নেহে তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আজ দেব! আমার একটি গুরু-প্রশ্নের মীমাংসা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।" যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেব তাহাকে সাদর-সম্ভাষণে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়ে, বল বল, তোমার কি প্রশ্ন আছে? এমন কি গুরু-প্রশ্ন যে, সে প্রশ্নের তুমি নিজে মীমাংসা করিতে না পারিয়া, আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমায় বল তুমি, আমি যথাসাধ্য তাহা বুঝাইয়া দিব।"

জগত্তারিণী দীনদয়াময়ী মহেশ্বরী তখন সাগ্রহে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রভু! আপনার নিকটই একদিন শুনিয়াছিলাম, যে কোন দিনে একবার গঙ্গাস্নান করিলেই পাপীর উদ্ধার হয়; আর, যদি কেহ দশহারার দিনে একবার গঙ্গাস্নান করিতে পারে, তবে তাহার দশজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। কিন্তু স্বামীন্, অদ্য একে দশহারা, তা'য় আবার এক মহাযোগ উপস্থিত। দেখিতেছি, এমন কেহই রহিল না, যে অদ্য গঙ্গা-স্নান না করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! বিশেষতঃ ঐ যে মণিকর্ণিকার ঘাট—ওখানে তো লোক ধরিতেছে না! তবে কি দেব, আজ হইতে

ভারতে আর কেহই পাপী রহিল না? সকলেই কি তবে আজ হইতে উদ্ধার পাইল?"

ভবানীপতি, হাসিতে হাসিতে, তাহাতে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়ে, এখন বুঝিতেছি, প্রশ্ন গুরুতর বটে! আচ্ছা, আমি তোমায় এখন আর কথায় ইহার কোন উত্তর না দিয়া একবার কাজে দেখাইতে চাহি, এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি! তুমি এক কাজ কর,—এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর বেশে, কাঁদিতে কাঁদিতে, আমায় ক্রোড়ে করিয়া, মণিকর্ণিকার ঘাটের একপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন কর। আমিও, এক মৃত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে, তোমার ক্রোড়ে পড়িয়া থাকি। আমাকে এইরূপে ক্রোড়ে করিয়া, গঙ্গাস্নানার্থী ঘাটের সমস্ত লোককে ডাকিয়া, তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে বল,—'আমার আর কেহই নাই—একমাত্র বৃদ্ধ স্বামী ছিলেন, ইনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে যদি কেহ দয়া করিয়া ইঁহার সৎকারে আমায় সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হই। নহিলে, আমার জাতি-ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হয়।'

"এই বলিয়া, তুমি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সকলকে ডাকিবে, তখন নিশ্চিতই তোমার নিকট অনেকেই উপস্থিত হইবে। আর, নিকটে কেহ আসিলেই, সেই সময় তুমি বলিবে,—'আপনারা আমার উপকার করিতে আসিতেছেন, ভালই। কিন্তু আমার একটী কথা আছে; সেটি শুনিয়া তবে আপনারা আমার উপকার করিতে অগ্রসর হইবেন। নহিলে আমার জন্য অকারণ আপনারা কোনরূপে বিপদস্থ হন, এরূপ বাসনা আমার নাই।' এই বলিয়া, তুমি বলিবে যে,—'আমার প্রতি এরূপ এক অভিশাপ আছে যে, যে কেহ আমার স্বামীর সৎকার

করিতে পারিবেন না। পুণ্যাত্মা না হইলে—নিষ্পাপ-শরীর না থাকিলে, কেহই আমার স্বামীর সৎকারে অধিকারী হইবেন না। যদি কেহ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সেরূপ করিতে অগ্রসর হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। আর, একথা বড় অলীকও নহে ; যিনি আমায় এরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাঁহার অভিশাপেই আজ আমি পতিহারা! সুতরাং আপনাদের মধ্যে যদি কেহ নিষ্পাপ-শরীর—পুণ্যাত্মা থাকেন, তবে তিনিই আসুন—আমার উপকারে অগ্রসর হউন। নচেৎ অনর্থক আমার উপকারও হইবে না, অথচ আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া প্রাণে মরিবেন ;—এরূপ কার্য্যে কেহ যেন অগ্রসর না হন।'

"এরূপ করিলেই, তোমার প্রশ্নের মীমাংসা আপনা-আপনিই হইবে। তুমি দেখিতে পাইবে, মোক্ষ-লাভ কাহার ভাগ্যাধীন।"

এই বলিয়া, মহাদেব ও পার্ব্বতী, দুইজনেই বাহির হইলেন। একবার দেখিতে চলিলেন,—জীবের উদ্ধার-অনুদ্ধার কিসে নির্ভর করে!

* * * *

মহামায়া এখন মায়াবিনী ব্রাহ্মণী। আর মহাযোগী এখন ব্রাহ্মণবেশে মহাযোগে নিমগ্ন। জগজ্জননী, সেই জগৎপিতাকে ক্রোড়ে করিয়া, ঘাটের ধারে বসিয়া আছেন; আর, স্নানার্থী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ হউন অথবা শূদ্র হউন, স্ত্রীলোকই হউন অথবা পুরুষই হউন, যে কেহ, আমার পতির সৎকার-কার্য্যে সহায়তা করুন। আমার আর আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। সৎকার-অভাবে আমার মৃতপতির সদ্গতি হইতেছে না।" ঘাটের লোকে অনেকেই সে কাতরোক্তি

শুনিয়া অগ্রসর হইতেছেন বটে; কিন্তু শেষ কথা শুনিয়াই—পুণ্যাত্মা ভিন্ন সে দেহ-সৎকারে পাপীর অধিকার নাই জানিয়াই—কাহারও আর তাহাতে সাহস কুলাইতেছে না। সকলেই সে দেহ-সৎকার করিতে গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন।

এইরূপে, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এক এক করিয়া, দেখিতে দেখিতে, লক্ষ লক্ষ যাত্রী, সেই ঘাটে স্নান করিয়া গেল; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই, দয়াপরবশ হইয়া. রমণীর উপকার করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কেহই, শেষ কথা শুনিয়া, সেখানে আর দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন না। "নিষ্পাপ-শরীর নহিলে এ দেহ সৎকার করিতে গেলে প্রাণ দিতে হইবে"—এ যে বড় ভয়ানক কথা! মনে মনে সকলেরই তো আপমাপন কীর্ত্তি-কাহিনী জানা আছে—মনের অগোচর পাপ তো কাহারও নাই! কাজেই এক্ষেত্রে—এই অসংখ্য নর-নারীর কাহারও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইল না। দীর্ঘ জটা-জুট-সমন্বিত ভস্ম-বিলেপিত-অঙ্গ সন্ন্যাসী—তাঁহারও এক্ষেত্রে সাহস হইল না। হরিনামাঙ্কিত-তনু, সর্ব্বদা হরি-জপরত সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ—তিনিও রমণীর শেষ বাক্য শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। সংসারী, উদাসী, ভিক্ষুক, বৈরাগী—কাহারও সে সাহস হইল না; কেহই আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া শবদেহের সৎকারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

এইরূপে প্রায় দিবা অবসান। ঘাটের প্রায় সকল লোকই স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া, পার্ব্বতী চমকিত হইলেন। মহাদেব তাহাতে বলিলেন,—"আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। জগতের গতিকই এইরূপ! ইহা

হইতেই বুঝিয়া লও, কাহার উদ্ধার হইবে, অথবা কে নরকস্থ হইবে।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়, একটি নিরক্ষর, কৃষ্ণকায়, জীর্ণদেহ, কৌপীন-পরিহিত কৃষক, মাঠের নিত্যকর্ম্ম সারিয়া, সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিল। সে, ক্রমে ধাপে ধাপে ঘাটে নামিতেছে, এমন সময়, পার্ব্বতী, পূর্ব্ববৎ তাহাকে ডাকিয়া, বলিলেন,—"ওগো, তুমি যদি আমার উপকার কর, তবেই হয়। মৃত-পতি ক্রোড়ে করিয়া প্রাতঃকাল হইতে আমি এই ঘাটে বসিয়া আছি। কিন্তু কেহই আমার স্বামীর সৎকার-কার্য্যে সহায়তা করিতে সাহসী হয় নাই। এখন, তুমি যদি আমার উপায় কর, তবেই হয়। নহিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।" ইহার পরই পার্ব্বতী আবার বলিলেন,—"কিন্তু একটা কথা এই যে,—নিষ্পাপ শরীর না হইলে কেহই ইহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না; তাহা হইলে তাহারও প্রাণ যাইবে। যদি তুমি নিষ্পাপ হও, তবেই আমার উপকার করিতে অগ্রসর হইও; নহিলে, অনর্থক চেষ্টার প্রয়োজন নাই।"

কৃষক, স্থিরচিত্তে রমণীর সমস্ত কথা শুনিল। শুনিয়াই, কিছুক্ষণ সে যেন নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই, আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল,—"গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, দশহারার দিন গঙ্গাস্নান করিলে দশ জন্মের পাপক্ষয় হয়। সুতরাং আমি যতই কেন পাপী হই না, গঙ্গাস্নান করিলে, আজ তো আমি নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইব! আর, সেরূপ হইলে, আমি কেনই বা এ রমণীর উপকার করিতে পারিব না? আমি যদি আজ 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া একবার ডুব দিয়া আসিয়া, এই দেহের

সৎকার-কার্য্যে অগ্রসর হই, তবে কে আমায় তাহাতে বাধা দিতে পারে?—বিশেষতঃ এই পরোপকার-কার্য্যে! পরের উপকার করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জগতে আর কি আছে? সে উপকারের জন্য এ অবস্থায় আমার প্রাণই যদি যায়, তবে তাহাতেই বা হানি কি? যাইহোক, আমাকে এ রমণীর সাহায্য করিতেই হইবে!" এইরূপ ভাবিয়াই, কৃষক, সেই ব্রাহ্মণী-বেশ-ধারিণী জগজ্জননীকে বলিল,—"মা, আমিই আপনার এ কার্য্য করিব। এখনও যদিও আমি পূর্ণ পাপী, কিন্তু জননী, গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলেই আমি তো নিস্পাপ হইব? তবে আর আমার ভাবনা কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আমি এখনই—ডুব দিয়া আসিয়াই, আপনার সহায়তা করিতেছি।"

এই বলিয়াই, কৃষক, ছুটিতে ছুটিতে, 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া, সেই পতিতোদ্ধারিণী গাঙ্গিনীর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিল। দেখিতে দেখিতে, অবগাহন করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই, বলিল,—"মা, আমি আসিয়াছি। এখন আমি নিস্পাপ-শরীর। সুতরাং, ভরসা করি, এখন আমার দ্বারাই আপনার কার্য্য শেষ হইবে।"

ইহার পরই, কৃষক, সেই মৃত-ব্রাহ্মণবেশী মহাদেবের শরীর ধারণ করিয়া, নিম্নতর সোপানে অবতরণ করিতে উদ্যোগী হইল। রমণী, শবের মস্তক ধারণ করিলেন; এবং কৃষক, তাঁহার পদ-দ্বয় ধরিয়া অবতরণে চেষ্টিত হইল।

এমন সময়ই, একি অলৌকিক কাণ্ড!—একি অদ্ভুত পট-পরিবর্ত্তন! দেখিতে দেখিতে, নিমেষের মধ্যে, তীরদেশ অত্যুজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত হইল। আকাশ হইতে ঘন ঘন পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল; নভঃস্থল হইতে যেন শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইতে

লাগিল। দেখিতে দেখিতে, আরও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই যুগল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-মূর্ত্তি, দেখিতে দেখিতে, হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন; এক সুদিব্য রথোপরি সে মূর্ত্তিদ্বয় স্থাপিত হইয়া এক রমণীয় শোভার আধার হইল। আর, সেই কৃষক,—সেও তখন সেই রথে! তখন কি তাহার সুদিব্য কান্তি—কি তাহার রমণীয় মাধুর্য্য! সে তখন, যোড়করে হর-পার্ব্বতীর স্তব-স্তুতি গাহিতে গাহিতে, একই রথে দিব্যধামে চলিয়াছে।

এরূপই পুণ্যাত্মার পরীক্ষা! এরূপেই সাধু-সৎ পরিচিত হয়। এরূপ দেখাইয়াই, মহাদেব, পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন,—"দেখিলে পার্ব্বতী! লোকের উদ্ধার-অনুদ্ধার কিসে হয়? প্রকৃত ভক্তি—আন্তরিক বিশ্বাস, এ-জগতে কি আছে যে, জীবের সদ্গতি হইবে? সে বিশ্বাস—সে ভক্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে কি আর ভাবনা থাকিত?"

ভক্তি-পরীক্ষা।

ভক্তি বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু। জড়-জগতে প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা বড়ই অল্প। ভক্তের আধিক্য থাকিলে, এ সংসার কি আর মরুময় হইত? যদি সংসারী ভক্ত হইতেন, যদি পরম-পিতা আমাদিগকে পাষণ্ড-নাস্তিক না করিয়া জগতে পাঠাইবার সময় কণামাত্র ভক্তিও আমাদের হৃদয়ে প্রদান করিতেন; তবে কি আর আমরা এমন হতভাগ্য হইতাম? হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল তিমি-নক্র পূর্ণ এই ধরিত্রীই, তাহা হইলে দেখিতাম, আজ স্বর্গের

নন্দনকানন ; দেখিতাম, এখানকার কণ্টকাকীর্ণ অগম্য অরণ্যেই আজ নন্দনের পারিজাত বৃক্ষ জন্মিয়াছে—শিবা-কুক্কুটের নৃত্য-গীতের পরিবর্ত্তে আজ তাহা হইলে এই নরকেই অপ্সরঃ-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের তানে বীণা-বেণু শ্রুত হইত! কিন্তু প্রকৃতই অভাগ্য আমরা—পিতা ইচ্ছা করিয়াই যেন আমাদিগকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে, আমাদের সে সুখের দিন এখনও বহু দূরে। বুঝি বা এ জগতেই সে সুখ পাইবার অধিকারী আমরা নহি। এখানে পড়িয়া আছি, যেন কেবল পরীক্ষার জন্য। তিনি কেবল এখানে আমাদের রাখিয়াছেন, দেখিবেন বলিয়া—আমরা কোন্ ফল-ভোগের অধিকারী!

স্বর্গ আর নরক, এই দুই-ই যেন সে পরীক্ষার ফল। পরীক্ষায় আমরা যেরূপ কৃতকার্য্য হইব, তিনি আমাদিগকে সেইরূপ ফল প্রদান করিবেন। যে ফল পাইবার যেরূপ উদ্যোগী আমরা হইয়াছি, তিনি সেই ফলই আমাদিগকে দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তের জন্যও অধিকদূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপে, নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারেই, আমরা তাহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই।

প্রতি জীবনই, উত্তাল তরঙ্গমালায় পতিত তৃণকণার মত, সংসার-সমুদ্রে কখনও ভাসিয়া উঠিতেছে—কখনও তলাইয়া যাইতেছে। বল দেখি, এ প্রহেলিকার মর্ম্ম কি? তুমি দীনহীন অন্নের ভিখারী বটে, কিন্তু তজ্জন্য তোমায় কায়িক, মানসিক বা সাংসারিক কোন কষ্টই অনুভব করিতে দেখি না; আর আমি লক্ষপতি, অথচ আমার সেরূপ কোন সুখই নাই—

কখনও রোগের জ্বালায়, কখনও শোকের সন্তাপে, একরূপে না একরূপে, আমি সর্ব্বদাই আত্মহারা! বুঝি না, চক্রধরের এ কি অপরূপ চক্র-বিবর্তন! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেই, সকল সহায় থাকিতেও, তাহাতে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যাইতেছি; অথচ নিঃসহায় অনাথ আবার সদর্পে ভ্রূকুটী দেখাইতেছে।

এখনও এ দৃশ্য আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। এখনও আমরা প্রতিনিয়তই দেখিয়া থাকি, ভক্তি ও ভক্তের কত ক্ষমতা —বিশ্বাসী কত বলীয়ান্! কিন্তু, হায়, কি বিস্মৃতি, কেন মুহূর্ত্ত-কালও সে সব আমাদের স্মরণ থাকে না? এ সব পরীক্ষা—এ সব দৃশ্য কি ভুলিবার?

হরিপদ এবং সত্যচরণ নামক দুইটী ব্রাহ্মণ-যুবা বাল্যাবধি যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বহু পাপকার্য্যে রত থাকে। উহাদের দু'জনেই, জগতে যে কত অপকর্ম্মের সূচনা করিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। চৌর্য্য, মিথ্যা কথা, নরহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি হরিপদের যেন অঙ্গের আভরণ ছিল—বাল্যাবধি সে যে কত চুরী, কত হত্যা, কত কদাচার করিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর সত্যচরণ!—সে লম্পট, সে অধার্ম্মিক। সে যে কত কুলকামিনীর কুল-হানি, কত সতী স্ত্রীর সতীত্ব-নাশ, কত লোকের ধর্ম্মেকর্ম্মে কত বিঘ্নপ্রদান করিয়াছিল, তাহাও বলিবার নহে। ফলতঃ উভয়েই মহাপাপী, ঘোর পাষণ্ড!

অধিক কি, উহাদের পাপভারে ধরিত্রী ক্রমে এতদূর ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন যে, ইহ-জীবনেই উহাদের পাপের ফল-প্রদান, ঈশ্বরের নিকট আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এ জগতেই পাপের উপযুক্ত শাস্তি-স্বরূপ, ঈশ্বর উহাদিগের দেহে 'মহাব্যাধির' সৃষ্টি,

করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম, পাপের ফলস্বরূপ এ জীবনেই উহারা মহব্যাধি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া অশেষ যমযন্ত্রণা ভুগিতে থাকে। আহা! পাপের কি শোচনীয় পরিণাম! এরূপ কঠোর শাস্তি, এরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে, বুঝি বা আর নাই!

এইরূপে, মহাব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, হরিপদ ও সত্যচরণ উভয়ে দিন দিন বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যেমন স্ফূর্ত্তি, যেমন অহঙ্কার ছিল; এখন তেমনই নিরানন্দ, তেমনই দর্পচূর্ণ হইয়া আসিল! দেখিতে দেখিতে, দুইচারি বর্ষের মধ্যে, মহাপাপী হরিপদের শরীরে কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হইল; তাহার গাত্র-মুখ অধিক বিবর্ণ হস্তপদ ক্ষতপূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দিনরাত্রিই তাহাকে কেবল হাহাকারে, "উহু—উহু—গেলাম—মলাম" করিয়া কাটাইতে হইল। অধিক কি, এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা যে, মৃত্যু হইলেই সে যেন তখন বাঁচে! আর, সত্যচরণেরও তখন সূচনা—তাহারও মুখ বিবর্ণ; হস্তপদ কেবল ফুলিয়াছে, কিন্তু ফাটে নাই। তবে জানি না, অন্তরের যাতনা উভয়েরই সমান কি না! তখনও যদি কিছু তারতম্য থাকে, কিন্তু বিশ্বাস, আর দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই উভয়েরই সমাবস্থা হইবে। হরিপদের মত সত্যচরণেরও শরীর গলিত-কুষ্ঠে খসিতে থাকিবে!

যাইহোক, প্রত্যক্ষ ফলভাগী হইয়া, কিছু দিনের মধ্যেই, হরিপদ ও সত্যচরণ উভয়েরই জ্ঞানের সঞ্চার হইল। উভয়েই তখন বুঝিল, কি কার্য্যে কি ফল-ভোগ করিতেছে! ক্রমে তজ্জন্য, প্রবল পরিতাপ তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাহারা তখন পরিতপ্ত অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল,—

"পিতঃ! যাহা করিয়াছি, তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু দয়াল তুমি, এবার আমাদিগকে ক্ষমা কর। আর আমরা কখনও তোমার পথ হইতে দূরে যাইব না, শপথ করিতেছি।"

এইরূপ পরিতপ্ত অন্তঃকরণে অবশেষে তাহারা পুণ্যভূমি তারকেশ্বর-তীর্থে মহাপ্রভু মহাদেবের শরণাপন্ন হইল। অনিদ্রায়, অনাহারে, সেখানে গিয়া 'হত্যা দিল'; ডাকিল,—"পিতঃ! আমাদিগকে রক্ষা কর।" তখন, আর তাহাদের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—শীত-গ্রীষ্মে সমান ভ্রূকুটী! কেবল প্রার্থনা,—কিসে ঈশ্বর এ মহাপাপীদের উদ্ধার করেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, এইরূপে কতই কাটিয়া গেল। তথাপি তাহাদের বিরাম নাই—তাহারা উভয়েই আর উঠিল না, নড়িল না, বা পশ্চাতেও ফিরিয়া দেখিল না। প্রাণের দায়ে, অকৃত্রিম ভক্তি, যেন তখন তাহাদের প্রাণে আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবানও 'ভক্তের ভগবান' চিরদিন। অকৃত্রিম ভক্তি পাইলে, তিনি আর কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? মহাপাপী মহা-পাষণ্ডও যদি পরিতপ্ত হইয়া একবার তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকে, তবে তিনি তখনই তাহার সে ডাকা শোনেন। নহিলে, তাঁহার ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা থাকিবে কেমন করিয়া? কাজেই, হরিপদ ও সত্যচরণের কাতর-ক্রন্দনও তাঁহার কর্ণে গেল; তিনি স্বপ্নে তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। তাহাদের উভয়কেই দেখা দিয়া তিনি যেন বলিলেন,—"বৎস হরিপদ! বৎস সত্যচরণ! যাও তোমরা, গৃহে যাও। সেখানে গিয়া, তোমাদের উভয়েরই বাড়ীর পশ্চাৎদিকের পুষ্করিণীর ঘাটে, এক

ধাপ নামিয়াই, জলের নিম্নে, হাঁড়ির ভিতর, এক এক দ্রব্য পাইবে। ভক্তি করিয়া তাহা খাইও—তাহাতেই তোমাদের সকল ক্লেশ দূর হইবে। অধিকন্তু, তাহাতে তোমাদিগকে পরলোকেও আর এ জন্মের পাপভাগী হইতে হইবে না।” এইরূপ বলিয়াই, ভগবান্‌ যেন জ্যোতির্ম্ময় আকারে তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তাহারা তাঁহার সেই দিব্যকান্তি, অপূর্ব্বজ্যোতিঃ দেখিয়া চমকিত হইল।

ইহার পর, সত্যচরণ ও হরিপদ উভয়েই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইল; এবং উভয়েই আপন-আপন আদিষ্ট দ্রব্য অন্বেষণে তৎপর হইল। অন্বেষণ করিয়া, হরিপদ প্রথমে দেখিল, সত্য সত্যই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি হাঁড়ি রহিয়াছে। সে আনন্দে তাহা উত্তোলন করিল। কিন্তু, উত্তোলন করিয়াই চক্ষু-স্থির!—সে দেখিল, তাহার ভিতর একরাশি বিষ্ঠা! কিন্তু অপূর্ব্ব ভক্তি—অদ্ভুত কাণ্ড! সে তখন এতদূর প্রেমোন্মত্ত যে, কিছুতেই সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না। “ভগবান যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন এই-ই আমার অমৃত”—এই বলিয়া, সে সেই দুর্গন্ধ অপবিত্র বিষ্ঠা, অমৃতজ্ঞানে হাতে তুলিল। তুলিয়াই মুখে দিতে প্রস্তুত! এমন সময়, একি আবার অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত কাণ্ড!—আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য সঙ্ঘটন! একি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, একি অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! মুখে তুলিতে গিয়াই, হরিপদ দেখিল,—নিমেষের মধ্যেই অস্পৃশ্য বিষ্ঠা সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত নবনীত-রূপে পরিণত! দেখিয়া, সে চমকাইয়া উঠিল, তাহার শরীর শিহরিল; তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল। সে মহানন্দে তাহা তুলিয়া মুখে দিল।

আর, তাহা মুখে প্রদান করিতেই, আরও বিস্ময়কর দৃশ্য! স্বপ্নের অতীত, কল্পনার বহির্ভূত কাণ্ড,—তাহার ব্যাধি-মুক্তি! দেখিতে দেখিতে, দণ্ডেকের মধ্যেই, হরিপদের শরীর পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার গলিত অঙ্গুলি পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন সুন্দর আকার ধারণ করিল; মুখ-শ্রী প্রফুল্ল-কমলবৎ ফুটিয়া উঠিল। অধিক কি, কখনও সে যে রোগাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা আর বোধই হইল না। সে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু, অপরদিকে, সত্যচরণের ঘটনা! সে ঘটনাও আবার এইরূপই বিস্ময়কর—এইরূপই অভূতপূর্ব্ব! কিন্তু বিপরীত! সেও স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল; পাইবার সময় পাইল, ঠিক সেই-ই জিনিস। অর্থাৎ হরিপদের মত সেও একরাশি বিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু, সে ঘোর পাষণ্ড—ঘোর নারকী! সে ভাবিল,—"না—না, আমি স্বপ্ন দেখিতে ভুলিয়াছি!" এইমাত্র ভাবিয়াই, সে ঘৃণা-সহকারে বলিয়া উঠিল,—"কি আপদ! কি আপদ! অস্পৃশ্য ছুঁইয়া আবার স্নান করিতে হইল!" এই বলিয়াই, সত্যচরণ সেই বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়িটিকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল,—ঘৃণায় তাহার নাক্কার আসিতে লাগিল।

নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই, কি অদ্ভুত কাণ্ড—কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সেই হাঁড়িটি ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সত্য-চরণেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে কেবল "জ্বলে মলেম—জ্বলে মলেম" করে, আর তাহার হস্তপদ ফুটিয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জীবন্ত শরীর জ্বলন্ত অনলে প্রদান করিলে, যেরূপ জ্বলন, যেরূপ ফোস্কা, যেরূপ ক্ষত, দণ্ডেকের মধ্যেই হইতে পারে; অদূরে হাঁড়িটি যেমন জ্বলিতে লাগিল, সত্যচরণেরও শরীর

দেখিতে দেখিতে সেইরূপ হইয়া আসিল। সে যন্ত্রণা—সে কষ্ট, অহো কি ভয়ঙ্কর—কি মর্ম্মভেদী! নরকের অধিক যাতনা যদি কিছু থাকে, বোধ হয়, সেই যাতনাই তাহাই।

যাইহোক, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে হাঁড়িটি নিবিল; আর, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সত্যচরণও গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণ-পূর্ব্বে যাহা চিহ্নমাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাই বিস্তৃত আয়তন!

অহো! ভক্তি ও ভক্তের পরীক্ষা কি গুরুতর--কি সমস্যা-পূর্ণ! অভাগ্য জ্ঞানহীন মূঢ় আমরা, তাই আমরা সে তত্ত্ব দেখিয়াও বুঝি না—শুনিয়াও শুনি না। পরম দয়াল, পরম পিতঃ! সে জ্ঞান আমাদের কবে হইবে, যেদিন আমরা তোমাকে প্রকৃত ভক্তি করিতে শিখিব!—ভক্তের মাহাত্ম্য যেদিন আমাদের মনে গ্রথিত হইবে! হে পিতঃ! সত্যচরণ-রূপে অন্ধ-বিশ্বাসী না করিয়া, হরিপদের মত ভক্ত-বিশ্বাসী আমাদিগকে কবে করিবে? সেদিন কি আসিবে?

ধর্ম্ম-মীমাংসা।

ধর্ম্ম বড়ই কঠিন জিনিষ। ধর্ম্মপালন তদপেক্ষা আরও কঠিন। কেবলমাত্র জপ-তপ বা আরাধনায় ধর্ম্মপালন হয় না, অথবা কেবলমাত্র সত্যপরায়ণ, ন্যায়বান বা জিতেন্দ্রিয় হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম—অতি গভীর চিন্তার বিষয়। আর, শাস্ত্রও সেই জন্য ভূয়োভূয়ো

আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ-বাক্য প্রদান করিতেছেন,—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং।
দেবা ন জানান্তি কুতো মনুষ্যা॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গুহ্যভাবে অবস্থিত আছে। দেবগণই সহসা তাহা বুঝিতে পারেন না; ক্ষুদ্র মনুষ্য তো দূরের কথা! এ কথা বাস্তবিকই ঠিক। আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পারি, কেবলই কি ধর্ম্ম সেইটিমাত্র? আমরা যাহা বুঝিয়া লই, বাস্তবিকই কি ধর্ম্ম তাই? আমাদের শাস্ত্র তো কই সেরূপ বলেন না! শাস্ত্রে আছে সত্য, সত্যকথা কহিতে হয়; শাস্ত্রে আছে সত্য, পরোপকারে মহাপুণ্য—প্রাণ দিয়াও পরোপকার কর্ত্তব্য; শাস্ত্র বলেন ঠিক, অহিংসা পরমোধর্ম্ম; শাস্ত্র বলেন সত্য, ক্ষমাশীল জিতেন্দ্রিয় হও। মানিলাম, এ সকলই সত্য; বুঝিলাম, এ সকল কথারই প্রতি অণু-পরমাণুতেই ধর্ম্মফল নিহিত আছে। সুতরাং এও স্থির করিতে পারিলাম যে, ধর্ম্মের ঐ সকল অনুশাসনই পালন করিব; আমি কখনই সত্য বই মিথ্যা বলিব না; পরের উপকার ভিন্ন কখনই অনাচার করিব না। কিন্তু, কেবল তাহা হইলেই কি আমার ধর্ম্মপালন হইল? আমি কেবলমাত্র সত্যবাদী, আমি কেবলমাত্র ক্ষমাশীল, আমি কেবল-মাত্র জিতেন্দ্রিয়—এইরূপ গুণান্বিত হইলেই কি নির্ব্বিঘ্নে ধার্ম্মিক-পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব? এই কি ধর্ম্মের কথা? এই কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ?

না—সেরূপ তো নহে? আমাদের শাস্ত্র তো কই সেরূপ বলেন না! যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এ সকলও কর্ত্তব্য, সত্য; কিন্তু কর্ত্তব্যের গুরুত্ব-বিবেচনা আবার তদুপরি অধিষ্ঠিত। এ

সকল কর্ত্তব্য পালন করিব সত্য; সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, ন্যায়পর হইব সত্য; কিন্তু সকলেরই সময়োচিত গুরুত্ব বুঝিয়া। নহিলে, কেবলমাত্র সত্যবাদী হইলেই বা ধর্ম্মরক্ষা হয় কই? কেবলমাত্র পরোপকারেই বা ধর্ম্ম থাকে কই? আবার যদি সকলগুলি অনুশাসনই আমাদের আবশ্যকীয় বলিয়া বুঝিতে পারি, তবে পরস্পরের বৈষম্যের সমতাই বা পাই কোথায়? অর্থাৎ সকল সময়েই যে সত্যপর অথচ পরোপকারী, ক্ষমাশীল অথচ জিতেন্দ্রিয়—এই সকল গুণেরই সমান ক্রিয়া দেখাইতে পারা যায়, তাহারই বা সাধ্য কি? হয় তো এমন বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে, যেখানে একটির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইলে অপরটির অমর্য্যাদা হয়; অন্যের সহকারীতায় একের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। কিন্তু তখন কর্ত্তব্য কি?

তখনই কি আবশ্যক হয় না, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব-জ্ঞান; তখনকারই কি প্রয়োজনীয় নয়, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান! বাস্তবিকই তো তাই! হিন্দুশাস্ত্রও এবিষয়ে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; প্রতি পদক্ষেপেই তাই তাঁহারা শাস্ত্রের এই অনুশাসন পালন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রের মত আর কোন শাস্ত্রই তেমন মীমাংসা করিয়া যান নাই। অন্য সকল বিষয়েই সকল শাস্ত্রেরই কথা যদিও এক, কিন্তু এইরূপ বিরোধ-মীমাংসা বোধ হয় কোথাও আর নাই। আর, সেইজন্যই হিন্দুশাস্ত্র এত পূর্ণ—এককালে হিন্দু জগতের মধ্যে এত বরণীয় হইতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় আর কোথাও এরূপ বোধ হয় নাই যে,—যেখানে উভয়ের প্রক্রি-

ধর্ম্মিতা, সেখানকার ব্যবস্থা কিরূপ? এই কথাটা আরও একটু বিশদ করা আবশ্যক। এই মনে করুন, আমি ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় উভয়ই; কিন্তু যখন আমার সমক্ষে একজন দুর্দান্ত পাপাচারী কোন একটি নিরীহ অবলার উপর বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হয়, তখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি তখনও কি ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চুপ করিয়া থাকিব? এই কি আমার ধর্ম্ম? কখনই নহে। সেস্থলে আমাকে ক্ষমা ত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইলে কখনই চলিবে না। কাজেই এইরূপ সকল সমস্যার সময় সময়োচিত কর্ত্তব্যের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ মীমাংসা-সঙ্কট পদে পদেই সম্ভব।

এরূপস্থলে হিন্দুর সুতরাং কি করা কর্ত্তব্য? ধর্ম্ম-মীমাংসাই কি এরূপ সময়ের একমাত্র সহায় নহে? কর্ত্তব্যের গুরুত্ব-স্থিরীকরণই কি তখনকার মুখ্য কার্য্য নহে? বাস্তবিকই তাই। এসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র যে কতদূর উচ্চ অঙ্গের সদুপদেশ সকল প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে, যেখানে একটি সত্য কথা কহিলে একজনের প্রাণহানির সম্ভাবনা; এরূপস্থলে শাস্ত্র বড়ই সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। বরং সে সত্যরক্ষায় পাপ-ভোগ বই কখনই কেহ পুণ্যলাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ সময়, কাল ও পাত্র বিবেচনায় কর্ম্ম করাও শাস্ত্রের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। নহিলে কখনই সৃষ্টির সুশৃঙ্খলা থাকে না।

এসম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের একটি সুন্দর মীমাংসা, দেখুন দেখি পাঠক, কত সদ্বিবেচনার পরিচায়ক! আমাদিগের

মহাভারতে ঐরূপ কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-উপলক্ষে এই সুন্দর মীমাংসাটি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

(পুরাকালে শিবি নামক একজন পরম-ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। সত্যবাদীত্বে, পরোপকারে, ন্যায়পরায়ণতায় সকল বিষয়েই তাঁহাকে সমান ধর্ম্মপর বলা যাইতে পারিত। সর্ব্বত্রেই নৃপতির গুণগান শুনা যাইত; সর্ব্বত্রেই তাঁহার যশোভাতি প্রভাসিত ছিল। একদিন নৃপতি রাজসভায় বসিয়া বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়, এক কপোত পক্ষী অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল; বলিল,—"মহারাজ, রক্ষা করুন—প্রাণ যায়। ঐ অদূরে শ্যেন পক্ষী আমায় হত্যা করিতে আসিতেছে।" ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি আর কি করেন? আশ্রিতের সংরক্ষণও তো ধার্ম্মিকের এক ধর্ম্ম! সুতরাং তিনিও অমনি উদ্বিগ্ন হইয়া কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাহাকে আশ্রয় ও অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই; আমিই তোমাকে রক্ষা করিব।" আশ্বস্ত হইয়া কপোত তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইত্যবসরে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ দীর্ঘশ্বাসে ছুটিয়া, শ্যেনপক্ষীও ক্রমে রাজ-সমীপে আগমন করিল; এবং রাজা কপোতকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাকে বলিল,—"মহারাজ, একি আপনার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ! আপনি আমার আহারে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া আমার অপকার-সাধনে অগ্রসর হইতেছেন কেন? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলে কি আপনার ধর্ম্মরক্ষা হইবে? ঈশ্বর আমাদের খাদ্যরূপেই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন; উহাদের খাইয়াই আমরা জীবনধারণ করি।

এরূপ অবস্থায় আমার খাদ্যদ্রব্য মুখ হইতে কাড়িয়া লুকাইয়া রাখা কি আপনার ধর্ম্মোচিত কার্য্য হইল? যাহা হউক, আমার খাদ্য আমায় প্রদান করুন। নহিলে, পরের অপকার করায় আপনার সমূহ ধর্ম্মহানি হইবে। ঈশ্বর যাহার জন্য যে দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সে দ্রব্য তাহারই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।"

নৃপতি এখন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে আশ্রিতের জীবন-রক্ষা, অন্যদিকে একজনের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ। —একজনকে বাঁচাইয়া তাহার উপকার করিতে গিয়া, অপর এক-জনের আহারে বিঘ্ন ঘটাইয়া তাহার সমূহ অপকার-সাধন! এ অবস্থায় এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য? বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুইদিকেই তখন তাঁহার ধর্ম্মহানি হয়। এরূপ কঠিন সমস্যায় তিনি, না অগ্রসর হইতে পারেন, না পশ্চাদপদ হইতে পারেন। কাজেই তখন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্র হইতে হইল। তিনি তখন ভাবিলেন,—"এ অবস্থায় উপায় কি? দুই দিকেই মহাপাপ। দুই দিকেই দুইটি প্রাণী-হত্যার পাতক হইতে হয়। একদিকে একজনকে রক্ষা না করিলে সে মারা যায়, অন্যদিকে অপর জনকে খাইতে না দিলে সে মারা যায়।" এইরূপ ভাবনা ভাবিয়াই, নৃপতির মন বড়ই চঞ্চল হইল। তিনি তখন সেই অগতির গতি শ্রীমধুসূদনের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন,— "হরি হে, উপায় কর!" আর, বলা বাহুল্য, সে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাঁহার কানে কানে কি এক মন্ত্র প্রদান করিয়া গেল; কে যেন তাঁহার কানে কানে কি করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে এক সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়া গেল।

তিনি তখন কি এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত করিয়া, সেই শ্যেন পক্ষীকে বলিলেন,—"আচ্ছা বেশ, তোমারও যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয়, আমি তাহাই করিতেছি। আমার আশ্রিত কপোতও প্রাণে বাঁচুক, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আহার অভাবে না মর, আমি তাহারই এক উপায় স্থির করিয়াছি।"

এই বলিতে বলিতে, নৃপতি, একখানি তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দ্বারা আপনার অঙ্গ হইতে খানিকটা মাংস কাটিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়া, বলিলেন,—"এই লও, তোমার আহার। এ কপোতের প্রতি আর কোন লোভ করিও না। আমার গাত্র-মাংসেই তোমার তৃপ্তি হউক।"

দেখ, জগতের জীব, দেখ কি প্রহেলিকা! বল দেখি কেহ, এরূপ ধর্ম্ম-মীমাংসায় এজগতে কে আর সক্ষম? কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মীমাংসা এতই সুন্দর! প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে এতটাই স্বার্থত্যাগী, এতটাই পরোপকারী, এতটাই সহিষ্ণুতারক হওয়া উচিত। নহিলে, কেবল নিজেরটুকু, কেবল স্বার্থটুকু খুঁজিয়াই ধর্ম্মপালন হয় না! আর, এই সকল কারণেই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে,—ধর্ম্মের তত্ত্ব বড়ই গুহ্যভাবে অবস্থিত, ধর্ম্মের মীমাংসা বড় কঠিন। এই মীমাংসায় যিনি বিশেষ ক্ষমবান, এই মীমাংসা-ব্রতের অনুষ্ঠানে যিনি বিশেষ পারদর্শী, এ জগতে তিনিই ধন্য—সার্থক তাঁহারই ধর্ম্মালোচনা।

সংসার ও সন্ন্যাস।

এ জগতে মনুষ্য-জীবনের দুইটি কার্য্য,—সংসার ও সন্ন্যাস। জগতে তাই দেখিতে পাই, হয় মানুষ বিষয়ী সংসারী হইয়া—পুত্রকলত্র-পরিবার-ভারে বিপন্ন রহিয়া দিনযাপন করিতেছে; নয় মানুষ সন্ন্যাসী উদাসী হইয়া—ফল-মূলাহারে জীবনধারণ করিয়া এ দুর্গম সংসারারণ্যে বিচরণ করিতেছে। তাই দেখিতে পাই,—মানুষ কোথাও ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দীনবেশে অন্যের দ্বারে অন্নের ভিখারী, কোথাও বা অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া দারুণ ঘৃণনীয় চৌর্য্যব্রতে ব্রতী, কোথাও বা আবার দুর্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া প্রবল প্রবলতম পরাক্রমে পরাক্রান্ত। এরূপই জগতের সংসার-দৃশ্য!

তারপর, অন্যদিকে সন্ন্যাস-দৃশ্যেও আবার দেখিতে পাই,—হয় তো কেহ ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ—সদাই মুখে তাঁর 'জয় শিব শম্ভু'; হয় তো কেহ হরি-নামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে—মুখে সদাই তাঁর 'হরি হরি'; হয় তো কেহ বনে, হয় তো কেহ শ্মশানে, হয় তো কেহ বা মশানে! এরূপই দুই দিকের দুই দৃশ্য। এমনই দুই দিকের দুইটি পথ।

কিন্তু এখন কোন্ পথে যাই? কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য? এখন, মনে সদাই ভাবনা,—এ কোলাহলময় সংসার শ্রেষ্ঠ, না সে শান্তির আলয় সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ? এ সংসার-নরককুণ্ডে ডুবিয়া হাবুডুবু খাওয়া শ্রেয়ঃ, না সে শোকতাপশূন্য পবিত্র সন্ন্যাস-সুধায় নবজীবন-লাভ বাঞ্ছনীয়? বাহ্য-দৃশ্যে দেখিতে, লোকতঃ শুনিতে, শাস্ত্রাদিতেও অধ্যয়ন করিতে,

সন্ন্যাসই অবশ্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সন্ন্যাসই অবশ্য সেই পরম পিতার পবিত্র চরণে আশ্রয় লইবার অন্তিম পথ—সন্ন্যাসই অবশ্য চিদানন্দে প্রেমানন্দে মানুষকে সুখী করিতে পারে।

কিন্তু সংসার! সংসার কি এতই হেয়? সংসার কি কেবলই পাপ-তাপ-শোকের আলয়? সংসার কি শুধুই নরক-যাতনা ভোগের স্থান? সংসারে কি কেবলই হলাহল—চারিদিকেই গরল? আমরা যতটাই যা ভাবি না কেন, সংসার আমাদের চক্ষে যতই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর হউক না কেন, কিন্তু বাস্তবিক সংসার সেরূপ নহে। আমরা সংসারে থাকিয়াও সংসারের কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া—সংসারের ধর্ম্ম প্রতিপালনে আমাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই বলিয়াই, আমরা এরূপ মনে করি। নহিলে, আমরা যদি বাস্তবিকই সংসারী হইতে পারিতাম—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে বাস্তবিকই যদি আমাদের সামর্থ্য থাকিত, তবে কি আর কোন ভাবনা থাকিত? কিন্তু তা তো করিতে পারি না—সেরূপ ব্যবহার আমরা তো কই শিখি নাই! সংসার না সংসার! সংসার-ধর্ম্ম না সংসার-ধর্ম্ম। আমরা কথাটা—নামটা জানি মাত্র; কিন্তু তাহার কার্য্য কি, অনুষ্ঠান কিরূপ, সে বিষয়ে আমাদের আদৌ অভিজ্ঞতা নাই। আর তাই-ই আমরা উন্নতি দেখাইতে হইলে—নিজেকে নিজে উন্নত করিতে হইলে, সদাই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসের কথা কই—সংসারীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী উদাসী হইতে যাই। ভাবি, সেই যেন আমাদের চরম পন্থা—সংসার না ছাড়িলে যেন আমাদের চরমের আর কোন গত্যন্তরই নাই।

আমরা বুঝি না, তাই এরূপ ভাবি। কিন্তু প্রকৃত যিনি

সন্ন্যাসী, তিনি সকলই বুঝেন। তিনি বুঝেন যে, সংসার ও সন্ন্যাসে প্রভেদ নাই। তিনি জানেন যে, সংসার ছাড়িয়া কেবল সন্ন্যাসী হইলেই আর মুক্তির চরম কার্য্য হইল না। এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু না বলিয়া কোন এক ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী এই বিষয়ে তাঁহার কোন এক নবীন শিষ্যকে যে উপদেশ-গল্প শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। এক্ষণে তাহা হইতেই অনেকটা সংসার ও সন্ন্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভক্ত সাধু, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনে বাধা দিয়া, তাঁহার শিষ্যকে বলিতেছেন,—"বৎস, বিচলিত হইও না। সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ঈশ্বরারাধনা করিবার সময় এখনও তোমার হয় নাই। সন্ন্যাস ও সংসারে যে কি প্রভেদ, তাহাও তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। তাই তোমার মন এমন বিচলিত ও চঞ্চল হইতেছে। বৎস, সন্ন্যাসী হওয়ার কথা কি বল, এই সংসারে সংসারী হওয়া অপেক্ষা, সন্ন্যাসী হওয়া কোন ক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। সন্ন্যাসী অপেক্ষা যে সংসারী হইতে পারে, সেই তো অধিক ধন্য। তুমি জান না বৎস, তাই এমন আকুলি-বিকুলি করিতেছ যে, সন্ন্যাস অপেক্ষাও সংসারীর গৃহধর্ম্ম কত শ্রেষ্ঠ? সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরে মন-সমর্পণ করা—সে তো সহজতর; কিন্তু সর্ব্বপ্রাণ হইয়াও—বিষম সংসার-চিন্তায় ভগ্নমনা থাকিয়াও, যে তাঁহাকে ডাকিতে পারে—তাঁহার ভাবনা ভাবিতে পারে, সেই কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাহার কঠোর সংসার-ধর্ম্ম-সাধনই কি সেই পরম পিতার পবিত্র চরণ আকর্ষণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম নহে? বৎস, সন্ন্যাসীর অন্য চিন্তা নাই, সন্ন্যাসী সবই

করিতে পারে—তন্ময় হইয়া ভগবৎ-প্রেমে আত্মবিলীন করিতে পারে; সে ভাব তাহার পক্ষে কঠোর ও কৃচ্ছ্রসাধ্য কিছুতেই নহে। কিন্তু তুমি!—তুমি সংসারে থাকিয়াও, পুত্রকলত্র-ভারে ভারাক্রান্ত রহিয়াও, যদি তাঁহাকে ডাকিতে পার, সেই তো ধর্ম্ম! তাই বলি, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না—সংসার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। আগে সংসার কি বুঝ, সংসারের কার্য্য কি কর, তারপর সন্ন্যাসী হইও; অথবা তখন যাহা তোমার প্রাণ চায়, তাহাই করিও। নহিলে, সংসারের কার্য্য কিছু না হইতেই, অত উতলা হইলে চলিবে কেন?

"বৎস! সংসারীর ধর্ম্ম অতি কঠিন। আমরা তাহা পালন করিতে পারি না বলিয়াই সংসার আমাদের নিকট বিষময়। মনে ভাবি, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিলেই উপায়ান্তর আছে। কিন্তু বৎস, সর্ব্বদা এইটুকু যেন স্মরণ থাকে, যাহার যে অবস্থা আছে, তাহার সেই অবস্থার উপযুক্ত কার্য্য করিলেই আর অনুতপ্ত হইতে হয় না। এই দেখ, সংসারের একটি পালনীয় ধর্ম্ম অতিথি-সৎকার। কিন্তু আমরা আজকাল এতই হেয় হইয়া পড়িয়াছি যে, অতিথির সৎকার দূরে থাকুক, অতিথি দেখিলে আমরা আবার সুমিষ্ট ভৎর্সনায় তাহাকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু যাঁহারা মানুষ ছিলেন, যাঁহাদের আজিও মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহারা এক অতিথি-সৎকার হইতেই আপনাদের সর্ব্বধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। অতিথি-সৎকারে প্রাণ-পর্য্যন্তও পণ করিতে হয়। অতিথি-সৎকারে বৃষকেতু প্রভৃতির শত শত জীবন্ত উদাহরণ তোমরা পাইয়া থাক; সে সকল কথা তোমাদের

জানাও আছে। ভাব দেখি, তাঁহাদের এই সংসার-ধর্ম্ম-পালনেই স্বর্গ-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলই লাভ হইয়াছিল কি না? পিতা-মাতার স্বহস্তে পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া অতিথিকে আহারার্থ প্রদান করা—একি শুনিতে ও বুঝিতে বিষম কথা নয়? কিন্তু বৎস, আশ্চর্য্য হইও না, গৃহীর ধর্ম্মই এইরূপ।

"বৎস! এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংসার-ধর্ম্মের উপদেশচ্ছলে গল্পটি একদিন স্বয়ং ভগবান, দেবী লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন। কিরূপে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, কথায়-কথায় সেই কথা উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, –'প্রিয়ে, যাহা ভাবিতেছ, তাহা নহে; সংসারীর ধর্ম্ম আবার আরও কঠোর।' এই বলিয়াই, তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি গল্প বলেন। তাঁহার গল্পটি এই,—

কোন এক রাজপুত্র এবং তাঁহার এক ভৃত্য এক সময়ে মৃগয়ার্থ গমন করেন। বহুদিন যাবৎ শিকার-অন্বেষণে নিরত থাকিয়া, অবশেষে একটি মৃগের অনুসরণে, তাঁহারা এক গভীর অরণ্যের মধ্যে পড়িয়া পথহারা হন। সে বনে, না আছে, তাঁহাদের আহার; না পান, তাঁহারা পানীয়। যতই চলেন, ততই বন। সঙ্গে যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাহাও সকলই এই সময় ফুরাইয়া যায়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারা ক্রমাগত ছটফট করিয়া বনে বনে ফিরিতে থাকেন। এইরূপে দুই দিন তাঁহাদের অনাহারে কাটিয়া যায়। শেষ দিন—তৃতীয় দিন—সে দিনও রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা কোনই আহার পান না। অবশেষে, যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় তাঁহারা আবার এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। এদিন আর তাঁহাদের

চলৎশক্তিও তেমন নাই—বড়ই ক্ষুধা। কেবলই তাঁহারা ভগবানকে ডাকিতেছেন; আর বারবার বলিতেছেন,—'হরি হে, একটি পক্ষীও এ বনে পাইলাম না, একটি ফলও মিলিল না! আমরা কি নিতান্তই তবে প্রাণে মরিব!' এই বলিয়া, প্রভু-ভৃত্যে সেই বনে বসিয়া রোদন করেন, আর কাতর-কণ্ঠে ভগবানকে ডাকেন। বিশেষ, যে সময়ে তাঁহাদের এই বিপদ, তখন আবার দারুণ শীত! বনে, শীতে তো তিষ্ঠানই দায়! —বিশেষ রাত্রে!—তায় আবার এমন ক্ষুধার উপর!

যাইহোক, অনেক করিয়া, ভৃত্য তখন, কতকগুলি লতা-পাতা জড় করিয়া, একটু আগুণ করিল। একে ক্ষুধার জ্বালা, তায় আবার শীতের কষ্ট—ইহাতে কতক্ষণ বাঁচা যায়? তাই সে, আস্তে আস্তে একটু আগুণ জ্বালিয়া, আপনার প্রভুর শরীরে এবং নিজের শরীরে একটু একটু সেক দিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুত্র ক্রমে সংজ্ঞাহীন হইলেন; ক্ষুধায় ছটফট করিতে করিতে শুইয়া পড়িলেন। ভৃত্য একবার ভগবানকে ডাকে, আর একবার তাঁহার শুশ্রূষা করে। এক একবার বা উপরের পানে তাকাইয়া বলে,—'ভগবান, আমাদের বাঁচাও!'

এইরূপেই রাত্রি কাটিতে থাকে। এদিকে, যে বৃক্ষের তলায় তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের কোটরে কোন এক শুক-সারী বাস করিতেন। তাঁহাদের দুইটি শাবকও সেই কোটরে ছিল। সারাদিন আহারান্বেষণে ক্লান্ত হইয়া, কোটরে ফিরিয়াই, তাঁহারা দেখেন,—বৃক্ষতলে, তাঁহাদের বাস-মূলে, এই শোচনীয় দৃশ্য—আহারাভাবে দুইটি প্রাণীই বুঝি মারা যায়! দেখিয়া, তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিল। সে দারুণ হাহাকার-

আর্তনাদে তাঁহারাও তখন ব্যথিত হইলেন। তখনই শুক-পক্ষী তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারীকে বলিলেন,—"দেখ পত্নী, ধর্ম্মই এই। বিপন্ন অনাহারী অতিথি দুইজন—আজ তাঁহারা আমাদেরই কাছে আসিয়া উপস্থিত! অতিথি বিমুখ হইলে, এজন্মে তো পক্ষী হইয়াছি, আর জন্মে যে কি হইব, তাহা কে বলিতে পারে? হয় তো নরকের কীট, নয় তো তদপেক্ষাও হীনাবস্থা হইতে পারে। তাই বলি, পত্নী, বাধা দিও না। আমার ধর্ম্ম এই সময়ই আমি পালন করিয়া যাই। এই-ই তার প্রশস্ত সময়। আর কেন?" শুক-পত্নী—এ দৃশ্যে তাঁহারও প্রাণ কাঁদিল। তিনিও অমনি স্বামীর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন,—"নাথ, তবে আমাকেও অনুমতি দেন—আমিই বা কেন পতিত থাকিয়া যাই? সঙ্গে সঙ্গে আমারও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মটা প্রতিপালিত হউক না কেন? স্বামীন, ইহ-জন্মের সকল সুখই তো ভোগ করিয়াছি; এখন পর-জন্মেও যাহাতে আমার নিষ্কৃতি হয়, প্রভু আপনি, আপনিই তাহার বিধান করুন।" এ কথায়, আরও পরিতুষ্ট হইয়া, শুক উত্তর করিলেন,—"পত্নী, আমিও আজ ধন্য যে, এমন স্ত্রী পাইয়াছিলাম। তবে এস পত্নী, আর বিলম্ব কেন? এস, এখনও উঁহাদের প্রাণ বাঁচাই। আর, সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের দু'জনের দুই রকমের গার্হস্থ্য ধর্ম্মও প্রতিপালিত হউক। পত্নী, এরূপ করিতে পারিলে, অতিথি-সৎকারও হইবে, আর তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মও প্রতিপালন করা হইবে। আর এক কথা, আজ যদি উঁহাদের জীবন বাঁচান যায়, তবে পত্নী, জানিও, আমাদেরও সার্থক জন্ম—সার্থক আমাদের জীবন!"

এই বলিতে বলিতেই, শুক-সারি—পতি-পত্নী দু'জনেই, তখন

পরস্পরে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। কোটরে যে দুইটি শিশু-সন্তান ছিল, তাহাদের প্রতিও একবার সাদর-সম্ভাষণ করিয়া লইলেন। বলিলেন,—"বৎসদ্বয়, তোমরা এখন আপনাপন জীবন-ধারণের উপযোগী সামর্থ্য পাইয়াছ। এখন, নিজ নিজ কার্য্য নিজে নিজে করিয়া লও। আর, একবার দেখ, ধর্ম্ম-পালন কিরূপে করিতে হয়।" এই বলিয়া, সস্নেহ-সম্ভাষণে তাহাদের বদন-চুম্বন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, পতি-পত্নী পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর, আস্তে আস্তে, বৃক্ষের একটি শাখার উপর আসিয়া, যে শাখার ঠিক নিম্নদেশে বসিয়া রাজপুত্র ও তাঁহার ভৃত্য দুইজনে আগুন পোহাইতেছিলেন, ঠিক সেইখানে আসিয়া, ধীরে ধীরে সেই আগুনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। প্রভু ও ভৃত্যের সম্মুখে—যেখানটিতে আগুন জ্বলিতেছিল, সেইখান-টিতেই, নীরবে তাঁহাদের জীবন্ত দেহ পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আবার সেই প্রভু-ভৃত্যের কানের কাছে বলিয়া গেল,—"আপনারা এই আহার করুন—আপনারা জীবন বাঁচান।" কি অভাবনীয় দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! জীবন্ত পক্ষীদ্বয় এই-রূপেই পুড়িয়া মরিয়া অতিথি অনাহারীর আহার হইলেন! কি কঠোর সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন! কি অভাবনীয় অতিথি-সৎকার! সঙ্গে সঙ্গে আবার কি পবিত্র পাতিব্রতা-ধর্ম্ম!

রাজপুত্র এবং তাঁহার ভৃত্যও তখন চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ এরূপে আহার প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। আর, সেই শুক-সারি—তখন ভগবান আপনিই বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিলেন। ক্ষুদ্র

বিহঙ্গম-জন্ম হইতেই তাঁহারা একেবারে দেবজন্ম প্রাপ্ত হইলেন! বৎস! এরূপই সংসার, এরূপই সংসারের ধর্ম্ম। তাই বলি, আবারও বলি, শুধু সন্ন্যাসী হইলেই হয় না, শুধু চিতাভস্ম মাখিলেই হয় না; এ সংসারে থাকিয়াও, করিতে জানিলে—বুঝিতে পারিলে, অনেক কার্য্য করা যায়।

ব্যাধ ও সাধক।

অস্পৃশ্য নীচজাতীয় ব্যাধের ঘরে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেই যে বিফল-জন্ম হইল, এমন নহে; অথবা জন্মাবধিই সাধু সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া ফল-মূলাহারে জীবন-ধারণ করিতে পারিলেই যে সার্থক-জন্ম, এ বিশ্বাসও ধ্রুব সত্য নহে। জন্ম-বৈগুণ্যে কিম্বা আচার-নৈপুণ্যে কি আসে যায়? ভগবানকে পাইতে হইলে—তাঁহার সেই অনন্ত কৃপাসিন্ধুর কণামাত্র প্রাপ্ত হইবার আশা করিলে, কেবলমাত্র তাঁহাতে একমন একপ্রাণ হইতে হয়। তদন্ত-প্রাণ, একান্ত-মনা, স্থির-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হইতে পারিলে, কিছুতেই তাঁহার কৃপালাভ সম্ভবপর নহে; হাজারই বাহ্য-চাকচিক্য থাকুক, হাজারই জটা-জূট-সমন্বিত বা গৈরিক বসন-পরিহিত হউক, কিছুতেই কিছু হয় না। আবার ছিন্নবস্ত্রে, রুক্ষদেহে থাকিয়াও, মনের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

একটি ব্যাধ ও একটি সাধকের সুন্দর চরিত্রে পাঠকগণকে আজ আমরা সেই পরিচয় প্রদান করিব।

দূরবনে, মৃগশিশুর অনুসরণে, প্রাণান্ত-পণে ব্যাধ ছুটিয়াছে। ব্যাধের শীর্ণদেহ, জীর্ণবস্ত্র, গাত্রের দুর্গন্ধ, ব্যাধোচিত তূণশর-সমন্বিত বেশভূষা—সকলই শান্তিময় অরণ্যে অশান্তির হেতুভূত হইতেছে। আর, সেই অরণ্যের অপর এক প্রান্তে—স্থির, প্রশান্ত, রম্য, ফল-পুষ্প-সমন্বিত নিরীহ বৃক্ষরাজী-পরিবেষ্টিত, এক মনোরম অধিত্যকা-প্রদেশে, ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া—তৎপার্শ্বে বসিয়া, এক কমনীয় কান্তি সাধু-সন্ন্যাসী ভগবানের ধ্যান-পূজায় নিমগ্ন আছেন। সেই গভীর অরণ্যের দুইদিকে এই দুই দৃশ্য। একদিকে ব্যাধ ও অপর দিকে সাধক। দুইটি বিপরীত দৃশ্যে সুন্দরী প্রকৃতিও এক নবসাজে সাজিয়াছেন।

কিন্তু, কি দুর্দ্দৈব! এ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি-পটে কিছুই কি স্থির থাকিবার নহে? দেখিতে দেখিতে, আসন্ন-প্রাণ সেই মৃগ-শিশু সেই সন্ন্যাসীর আশ্রম-অভিমুখে ছুটিল। অনুসারী ব্যাধও অমনি তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। সন্ন্যাসীর সেই শান্তিময় আশ্রমে ক্রমে অশান্তি-কোলাহল উত্থিত হইল; বনদেশ প্রক-ম্পিত, আর আর বন্যপশুগণও প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। কিন্তু একাগ্রচিত্ত ব্যাধের আর কোন দিকেই দৃষ্টি নাই—সে যেমনই অনুসরণ করিয়াছিল, কিছুতেই কিছু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেইমতই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। এই সে হরিণ-শিশুর উপর শরনিক্ষেপ করে—এই সেই হরিণ-শিশুর প্রাণান্ত হয়, তখনকার তাহার এমনই ভাব!

এমন সময় ব্যাধ চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার চলদ্গতি রোধ হওয়ায়, সে আপনার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

দেখিয়াই, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, দিব্য-কান্তি, দীর্ঘ-জটাজুট-সমন্বিত, ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ, এক সন্ন্যাসী তাহার পদতলে। সে একান্তমনে চলিয়া—নীচের দিকে আর না তাকাইয়া, এমনই অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছে—ছুটিতে ছুটিতে তাহার চরণদ্বয় সেই ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র সাধুর মস্তকোপরি পতিত হইয়াছে! দেখিয়া, ব্যাধের অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। সন্ন্যাসী যেমন, ক্রোধভরে উঠিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইবেন, সেও অমনি, তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, আমি পাতকী, আমি নারকী—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না।" এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া, ব্যাধ কাঁদিতে লাগিল।

তাহার সে ভাব দেখিয়া, সন্ন্যাসীর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি, হাত ধরিয়া উঠাইয়া, ব্যাধকে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই। তুমি নিশঙ্ক-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন কর।" আশ্বাস পাইয়া, বিশেষ এমন একটা গুরুতর অপরাধ হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া, কি জানি কেন, ব্যাধের মন ফিরিয়া গেল। কাতর-প্রাণে, সে তখন সেই সন্ন্যাসীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, আপনি কে? যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় দর্শন দিয়াছেন, তবে আপনার পরিচয় প্রদান করুন। প্রভু! আপনাকে দেখিয়া, আমার আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছে না; মনে করিতেছি, এখানেই থাকিয়া, আমি আপনার চরণ-সেবা করিয়া, জীবন সার্থক করিব। এই আমি আমার ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলাম। আপনি আমায় আদেশ করুন—

এক্ষণে আমি আপনার চরণ-সেবা করিয়া চরিতার্থ হই।” এই বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ব্যাধ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার অনুমতি না পাইলে, কিছুতেই তাঁহার পদদ্বয় পরিত্যাগ করিবে না, এমনই তাহার মনের ভাব!

সন্ন্যাসী দেখিলেন, বিষম বিভ্রাট! তিনি সংসারের কোলাহল সহিতে না পারিয়া—সংসারত্যাগী হইয়া, এই দূর বনে ঈশ্বরারাধনা করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু এখানেও তাঁহার সেই শঙ্কট! তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে ভাবিলেন, —“পাপ সঙ্গে সঙ্গেই আসে! যে ভয়ে আমি গৃহত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে আসিয়া, বনবাস আশ্রয় করিলাম, এখানেও আমার সেই ভয়!” এই ভাবিয়াই, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,— “এ যেরূপ নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট কথায় ইহাকে তাড়ান সহজ নহে! আচ্ছা, তবে এক কৌশল করিয়া ইহাকে তাড়ান যাউক।” এইরূপ স্থির করিয়াই, তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—“ব্যাধ, তোমাকে অনায়াসে আমি আমার এ আশ্রমে রাখিতে পারি; আমার শিষ্য-স্বরূপ তোমাকে ঈশ্বর-আরাধনায়ও দীক্ষিত করিতে পারি। কিন্তু বৎস, তৎপূর্ব্বে আমার একটি প্রতিজ্ঞার কথা তোমাকে বলিতে হইতেছে। আমি যেজন্য আজ বনবাসী, যে রত্ন হারাইয়া আমি আজ উদাসী, বৎস, আগে তাহা শ্রবণ কর। আমার অন্ধের যষ্টি, একমাত্র জলপিণ্ডের স্থল, একটি পুত্র ছিল। আমার সেই পুত্র বড়ই দুরন্ত; কিছুতেই কাহারও কথা সে সহ্য করিতে পারিত না। একদিন, কোন এক বিশেষ অপরাধে, আমি তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলাম। পুত্র আমার, সেই অভিমানে, তদবধি

গৃহত্যাগী-বনবাসী হইয়াছে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে, ছুটিতে ছুটিতে, সে পলায়ন করিয়াছে। আমিও বৎস, তাহারই অনুসরণে আসিয়া, এ পর্য্যন্তও তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে মনের ক্ষোভে এই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, শান্তি-সুখে কাল কাটাইতেছি। আর, সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমি আর কাহাকেও সহসা এ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব না। তবে যে আমার সেই পুত্রকে ধরিয়া আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকেই আমার শিষ্য করিতে পারি। বৎস, দুঃখিত হইও না, আমার প্রতিজ্ঞা, তদ্ভিন্ন আমি আর কাহাকেও আমার শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিব না। এক্ষণে, এই সমস্ত বুঝিয়া, ইচ্ছা হয়, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর—নয় গৃহে চলিয়া যাও। ফল কথা, আমার পুত্রকে যদি ধরিয়া আনিতে না পার, তবে আমি কিছুতেই তোমাকে শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসীর ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সরল-চিত্ত ব্যাধ বিমর্ষভাবে উত্তর করিল,—"দেব, আমি তাহাই করিব। আমিই আপনার পুত্রকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিব। এক্ষণে, আপনি আমাকে বলিয়া দেন যে, আপনার সেই পুত্র কিরূপ, তাঁহার বয়সই বা কত, তিনি দেখিতেই বা কেমন?"

প্রজ্ঞাবুদ্ধি তাপসবর ব্যাধের এইরূপ আগ্রহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। হাসিয়া, ভাবিলেন,—"এ যেমন নির্ব্বোধ, ইহাকে তেমনই তাহার প্রতিফল দেওয়া উচিত।" এই স্থির করিয়া, তিনি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সেই পুরুষ-প্রধান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ বর্ণনা করিয়া, ব্যাধকে কহিলেন,—

"ব্যাধ শুনিলে—আমার পুত্রের রূপ ! সেই মস্তকে শিখিপুচ্ছ-ধারী, সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, সেই মোহন বংশীধারী, সেই নূপুর-ধ্বনিত চরণ-যুগল, সেই বামেহেলা শ্রীমুরারী, বৎস, সেই-ই আমার পুত্র। এই বনে,—এই দিকে, আমায় কাঁদাইয়া, সে আমার চলিয়া গিয়াছে। যদি তুমি তাহাকে ধরিয়া আনিতে পার, তবেই তুমি আসিও। নহিলে, জানিও, আর ফিরিলে—ফিরিয়া আমায় এরূপে বিরক্ত করিলে, তোমার আর অব্যাহতি নাই। নিশ্চিতই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

একান্ত-প্রাণ ব্যাধ তাহাতেই স্বীকৃত হইল। বলিল,—"যে আজ্ঞে প্রভু, আমি তাহাই করিব। যেরূপে পারি, যেখানে পাই, আমিই আপনার পুত্রকে ধরিয়া আনিব।" এই বলিয়াই, সেই তপস্বী-চরণে প্রণতি-পূর্ব্বক, ব্যাধ সেই গভীর অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু, কিছুদূর গমন করিয়াই, সে অনন্ত রূপরাশি হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিয়া, ব্যাধ আবার তপস্বী-সমীপে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া, নিবেদন করিল,—"দেবতা, আর একবার আপনি আপনার পুত্রের রূপরাশি আমায় শুনাইয়া দেন। সে রূপ আমি মনে রাখিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসীবর ইহাতে একটু হাসিলেন। হাসিয়া, আবার একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অনন্ত রূপরাশির যতদূর পারিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। সেই প্রতি পদ নখরে কোটি চন্দ্রপ্রভা, সেই অলক্তরঞ্জিত চরণ-শোভা, সেই পীত-ধড়া মোহন-চূড়া, সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল—একে একে, তপস্বী, সকলই শুনাইলেন; শেষ বলিলেন,—"যাও বৎস, যাও; তবে আর আমায় বিরক্ত করিও না।"

ব্যাধ চলিল। কিন্তু আবার তাহার সেই ভ্রান্তি!—সে কিছুতেই সে অপূর্ব্ব অনন্ত রূপ-রাশি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিল না। সুতরাং আবার সে ফিরিয়া আসিল, আবার তাঁহার চরণে প্রণতি-পূর্ব্বক, সেই বর্ণনা শুনিতে চাহিল। ক্রোধে, তাচ্ছিল্যভাবে, তপস্বী আবার সে রূপ-রাশির বর্ণনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই! একবার, দুইবার, তিনবার! তিনবার এইরূপে সন্ন্যাসীকে বিরক্ত করা হইলে, তিনি আরও ক্রোধ-কম্পান্বিত স্বরে উত্তর করিলেন,— "বারবার তিনবার বলিলাম! আবারও যদি তুই আসিস, তবে আর তোর নিস্তার নাই। এবার আর আমার পুত্রকে না আনিতে পারিলে তুই কিছুতেই আসিস না।"

ব্যাধ আর কি করিবে? কাজেই তাহাকে ভগ্নমনে ভগ্নপ্রাণে ফিরিতে হইল। কিন্তু ব্যাধের একান্ত আশা, তখনও তপস্বীর পুত্রকে ধরিয়া আনিবে। একমনে একপ্রাণে সে আবার সেই গভীর বনোদ্দেশে চলিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই, ব্যাধ একই মনে চলিতে লাগিল। বনের পর বন, বৃক্ষের পর বৃক্ষ, পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বত-শ্রেণী, কতই যে অতিক্রম করিল—কত হিংস্র জন্তু, বন্যপশু, কত [illegible]-সরীসৃপ, কত ভল্লুক-ব্যাঘ্র যে তাহার পথের বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুতেই ব্যাধের ভ্রূক্ষেপ নাই; সে কেবল একদৃষ্টে একমনে চলিতেছে। তাহার দৃষ্টি কেবল সেই একই দিকে,—কোথায় সেই বংশীধারী শ্রীমুরারী—কোথায় সেই বামেহেলা পীতধড়া মোহন-চূড়া!

কিন্তু, কি ভগবানের লীলা, সত্য সত্যই ব্যাধের আশা পূর্ণ হইল। সত্য সত্যই ব্যাধ সেই বনদেশের দূর প্রান্তে, সেই তপস্বী-বর্ণিত রূপ-সমন্বিত একটি বালককে দেখিতে পাইল। দেখিয়া, তাহার নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হইল, প্রাণে অপার আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ব্যাধ তখন, আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে, ভক্তিভরে বলিয়া উঠিল,—"এস, গুরু-পুত্র, এস—এস; আর কেন আমাদের কষ্ট দেও?" এই বলিতে বলিতে, ব্যাধ তাঁহাকে ধরিতে গেল। ভক্তের ভগবান ভক্তিডোরে বাঁধা। ব্যাধ যখনই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে, তখনই তো তিনি তাহাকে ধরা দিয়াছেন! কাজেই, অনায়াসেই, ব্যাধ তাঁহাকে ধরিতে পারিল। ধরিয়াই, কাঁদিতে কাঁদিতে, ব্যাধ তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—"কেন গুরুপুত্র, কেন আর আমাদের এত কষ্ট দিতেছ? তোমার পিতা—আহা তিনি তোমার অভাবে কতই কষ্ট পাইতেছেন! এস এখন, তোমায় তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই।" ভক্তপ্রাণ ভগবান আর কি করিবেন? ভক্তের নিকট তাঁহার আর উপায় কি? কাজেই, তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ব্যাধ আনন্দে উৎফুল্ল হইল; ভগবানকে ক্রোড়ে পাইয়া জন্ম সার্থক করিল।

এইরূপে, ভগবানকে ক্রোড়ে লইয়া, ব্যাধ পুনরায় সেই তপস্বী-সমীপে উপনীত হইল। তাঁহাকে আহ্লাদ-সহকারে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"গুরুদেব, এই আপনার পুত্রকে লউন।" ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র সন্ন্যাসী, হঠাৎ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চমকিয়া উঠিলেন। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল সেই ব্যাধ দণ্ডায়মান; কিন্তু,

কি আশ্চর্য্য, ব্যাধের ক্রোড়স্থিত ভগবানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না। অথচ, ব্যাধ বারবার বলিতে লাগিল,— "এই লউন, গুরুদেব, আপনার পুত্র!"

তপস্বী তখনও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু, সকলই বুঝিলেন। বুঝিয়া, এক নিদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস ব্যাধ, তুমি একবার উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ও কবে আমার প্রতি সদয় হবে?" ভগবান উত্তর করিলেন,—"শত জন্মে।"

তপস্বী মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্যাধও আর কোন কথা কহিতে পারিল না; ভগবানকেও আর কিছু বলিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে, ক্ষণপরেই, এক দিব্য রথে সেই ব্যাধ ও ভগবান একত্রে—একই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, তাঁহারা উভয়েই স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। আর সেই তপস্বী-সন্ন্যাসী, এত আরাধনা-আবাহনে জীবন-যাপন করিয়াও, অরণ্যে তৃণ-শয্যায় শায়িত রহিলেন। একমাত্র মনের বাত্যয়েই দুই জনের এই দুই অবস্থা সঙ্ঘটিত হইল।

মৃত্যু-চিন্তা।

এজগতে যত কিছু ভয়াবহ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে মৃত্যু-চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান। জীবের জীবনে এতদপেক্ষা ভয়ঙ্কর পদার্থ আর নাই। কি অতুল যশ-সম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ মহারাজ,

কি ভিক্ষোপজীবি অন্নের কাঙ্গালী দীনদরিদ্র—মৃত্যু-চিন্তার নিকট সকলেই পরিত্রস্ত। মৃত্যুর যে কি এক প্রলয়ঙ্করী ঘোরা তামসী মূর্ত্তি, মৃত্যুর যে কি সেই করাল অগ্নি-উদ্গীরণকারী ভীষণ প্রহেলিকাময় দৃশ্য—সকলকেই তাহার নিকট পরাভব মানিতে হয়। মেদ-মাংস-অস্থি-নির্ম্মিত অল্পভোগী মানুষ—সে তো মৃত্যুর নিকট স্বতঃই নত-শির থাকিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—মৃত্যু-চিন্তার কি সম্মোহিনী শক্তি—তাহার নিকট সেই কেবল-মাত্র অনুভবময়, আকার-বিহীন, অনবলম্বনীয় ইন্দ্রিয়-আদিও পরাভূত! চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ ও স্পর্শন প্রভৃতি তাহাদের কার্য্য-পরম্পরা—অহো, কি সৃষ্টি-কৌশল—মৃত্যু তাহাদেরও অধিপতি! বাস্তবিকই, বলিতে কি, মৃত্যুর এতই প্রকোপ যে, এ দেখিয়া কখনও কখনও এমনও মনে হয়, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্ব-শ্রষ্টা—তিনিও বুঝি উহার আয়ত্বাধীন—উহাকে এমনই কি এক অসীম ক্ষমতায় ক্ষমতান্বিত করিয়াছেন!

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! আজ এক গুরু-শিষ্যের উদাহরণে আপনাদিগের নিকট সেই অপূর্ব্ব মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিব।

কিছু দিবস অতীত হইল, বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমায় এক অতুল-সম্পত্তি-বিক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। যেমন বিভব-ঐশ্বর্য্য, তেমনি তাঁহার যশ-খ্যাতি। সাধু-পুরুষেরও তিনি অগ্রণী ছিলেন; তাঁহার দান-ধ্যান, কীর্ত্তি-কলাপ ও সাধুতার গুণে তিনি একরূপ প্রাতস্মরণীয় হইয়াছিলেন।

তাঁহার গুরুদেবও তেমনই এক মহাপুরুষ। সর্ব্বদাই যেমন গুরু-সেবায় তিনি সম্যক উদ্যোগী থাকিতেন, গুরুদেবও

তেমনি তাঁহাকে, সন্তানের ন্যায় সদুপদেশ প্রদান করিয়া, নিয়তই সুপথে পরিচালন করিতেন।

এইরূপেই বহুদিন কাটিয়া যায়। নৃপতিও স্বীয় গুরুদেবকে আপন আশ্রয়ে আনয়ন করিয়া—পিতৃপরায়ণ সন্তানের পিতৃ-সেবার ন্যায়—দিবারাত্রি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যাপৃত আছেন। যেখানে যে সু-খাদ্যটি পান, যেখানে যে মূল্যবান বস্ত্রখানি দেখেন, সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, আপন গুরুদেবের সেবায় নিয়োগ করেন। আর, গুরুদেবও, নৃপতিকে আপন সন্তানবৎ ধর্ম্মশিক্ষাদি প্রদান করেন।

এইরূপে, একদিন, গুরুদেবের নিকট হইতে ধর্ম্ম-উপদেশ পাইবার কালে, নৃপতি, কোন এক কারণে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, আপন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু! আজ আমার মনে বড়ই এক সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই।"

প্রাজ্ঞ-মূর্ত্তি গুরুদেব, নৃপতির ঈদৃশ প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাৎসল্যভাবে উত্তর করিলেন,—"বল বৎস, তোমার কি প্রশ্ন? যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি অবশ্য তাহার পূরণ করিয়া দিব।"

নৃপতি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"গুরুদেব! আজ কয়দিন হইতেই আমার মনে এই এক প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, আপনিই বা এত সংযমী হইলেন কিরূপে; আর, হতভাগ্য আমি—আমিই বা এখনও কেন আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল রিপুগণকে দমন করিতে পারিলাম না? দেব! উল্লেখে কেবলমাত্র পাপের

ভাগী হওয়া, কিন্তু না বলিলেও নয়! না বলিলে, না জানিলে, মনে আমার আর শান্তি পাইতেছি না; তাই দেব, ক্ষমা করিবেন, সে পাপ-কথাও আজ মুখে আনিতে হইল। দেব! আমার সে পাপ-প্রশ্ন এই,—আপনি আর আমি, আজকাল আমরা দু'জনেই এ রাজপুরের কর্ত্তা। বরং আমার নিজের অপেক্ষাও আপনাকে অধিক স্বাধীনতা দিয়াছি। আহারে বলুন, ঐশ্বর্য্য বা বিলাসের দ্রব্যে বলুন, কিছুতেই আজকাল আমি আর আপনার 'উপরে' যাই না। বরং সকল বিষয়েই আপনার অপেক্ষায় আমি কমাইয়া আনিয়াছি; আর, সকল সুখ-সমৃদ্ধিও আপনাকেই ভোগ করিতে দিয়াছি। এই যথা,—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যত কিছু সারবান সুখাদ্য আছে, তাহার সকলই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আজকাল আপনাকে খাওয়াইয়া থাকি; আর আমি, একবেলা-মাত্র বহুদিনের পুরাতন তণ্ডুলের একমুঠা অন্নাহারে জীবন-ধারণ করি। এভিন্ন, আজকাল আহার-বিলাস আর আমার কিছুই নাই। অথচ, আপনার কোন বিষয়েই কোন ক্র[illegible]য়াখি নাই। যা' কিছু সু-আহার, আজকাল তাহা সকলই আপনার; যা' কিছু সু-পরিচ্ছদ, আজকাল তাহা সকলই আপনার। আর আমি, যাহা নহিলে নয়, তাহাই-মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু দেব! তবু আমি, কেন এত উচ্ছৃঙ্খল—আমার মন কেন এখনও এত কলুষিত? আর আপনি—এত ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী থাকিয়াও—কেমন করিয়া দেব, এমন নির্লিপ্ত উদাসী? আপনার নিকট এত সুশিক্ষা-উপদেশ পাইয়াছি—এত চিত্ত-রোধের উপায়ও শিখিয়াছি; তবু দেব, বলিতে ঘৃণা হয়, এখনও কেন একটি সুন্দরী স্ত্রীলোকের

দেখিলে আমি চঞ্চল-চিত্ত হই—একটি লোভের সামগ্রী দেখিলে আমি প্রলোভিত হই? আর আপনি, এমন আহারে—এমন বেশ-ভূষায় থাকিয়াও, বলুন দেখি দেবতা, কিরূপে এত নিস্পৃহ? এত সুন্দরী শোভাময়ী রাজ-অন্তঃপুরনারী নিয়ত আপনার পরিচর্য্যায় রত; এত ষোড়শী রূপসী, রাজকন্যা নিশি-দিন আপনার সেবা-তৎপর, তবু দেব—তবু কেন—আপনি এত অচঞ্চল! আপনার বিলাস-সুখ-তৃপ্তির জন্য আমিও কত অলোক-সামান্যা সুন্দরীকে আপনার পরিচর্য্যায় পাঠাইয়াছি—ভাবিয়াছি, আপনি কোন বিষয়েই কোন কষ্ট না পান! কিন্তু দেব, একি আপনার —একি সংযম-শিক্ষা! বলুন আমায়—বলুন প্রভু—কিরূপে আপনি এ সঙ্কট-শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন? এ অভাগা শিষ্য আপনার—তার কি সে শিক্ষার কোন উপায় নাই?”

এই বলিতে বলিতেই, অশ্রুজলে নৃপতির বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। গুরুদেবের চরণ-প্রান্তে পড়িয়া, উপায়-প্রার্থী হইয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। শিষ্য-বৎসল গুরুদেব তখন, নৃপতির হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক, তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন; বলিলেন,— “বৎস! চিন্তা নাই। একাগ্র-চিত্ত থাকিলে, অবশ্যই তুমি সংযম-শিক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু বৎস, সে বিষয়ে এখন আর তোমায় কোন মৌখিক উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না; সে উপদেশ অনেক দিন হইতেই তুমি পাইয়াছ। এখন একবার কার্য্যতঃ তোমায় দেখাইব যে, কিরূপে তুমি আমার মত হইতে পার! বৎস! চলিত কথায় বলে,—‘দেখে শেখা, আর ঠেকে শেখা।’ মুখে আর কিছু বলিব না; ‘ঠেকে শেখা’ আর ‘দেখে শেখা’ কি, এখন তাই একবার তোমায় দেখাইব ও শিখাইব।”

অতঃপর গুরুদেব আবার বলিলেন,—"বৎস! তবে এক কাজ কর। তোমার রাজ্য-মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান কোন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আন। আনিয়া, তোমার যে প্রমোদ-উদ্যান আছে, সেই উদ্যানের একটি গৃহ-মধ্যে তাহাকে বাস করিতে দেও। তদ্ভিন্ন, খাদ্য-দ্রব্যাদিও—ঘৃত-সর-নবনী প্রভৃতি যাহা কিছু বীর্য্যবর্দ্ধক ও উপাদেয়—প্রচুর পরিমাণে তাহাকে প্রদান করিতে থাক। অধিকন্তু, তাহার বিলাসের উপযোগী পরিচ্ছদাদিতেও যেন কোন ত্রুটি না হয়। এইরূপে, প্রায় মাসাধিক অতীত হইলে, একদিন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঐ উদ্যানের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেও। তারপর, সেই দিবস রাত্রিতে, তাহার আবাস-গৃহ সম্যক সুসজ্জিত ও আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়া, রাজ-অন্তঃপুরের যে কোন শ্রেষ্ঠা ষোড়শী সুন্দরীকে তাহার নিকট প্রেরণ কর; আর, তাহাতে সে যেন স্পষ্টই বুঝে যে, তাহার উপভোগের জন্যই ঐ সুন্দরীকে পাঠান হইতেছে। ইহার পর আর যাহা যাহা করিতে হয়, সে ভার আমার উপর। যুবতী যেরূপে প্রেমালাপ করিবে, আমি তাহাকে তাহা শিখাইয়া দিব—তাহার বিহার-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার জন্যও আমিই দায়ী থাকিব। সেজন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। যাহাকে হউক, রাজ-অন্তঃপুর হইতে নিশঙ্কচিত্তে সেদিন তুমি পাঠাইও; কিন্তু, যেই যাইবে, সাবধান, যাইবার পূর্ব্বে, যেন একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়।"

নৃপতি প্রথমতঃ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন,—গুরুদেব তাঁহাকে কি এ বিদ্রূপ করিতেছেন! কিন্তু কি

করেন? গুরুর আজ্ঞা—কিরূপে অবহেলা করেন? কাজেই সকলই শিরোধার্য্য বলিয়া মানিতে হইল।

* * * *

বন্দোবস্তও সেইরূপ হইল। একমাস অতীত হইল। যে সুন্দরী সেই যুবকের সহিত প্রমোদোদ্যানে বিহারার্থ গমন করিল, তাহার প্রতিও যাহা কিছু বক্তব্য, গুরুদেব বলিয়া দিলেন।

* * * *

যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিন আকাশ নির্ম্মল—স্বচ্ছ। পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশ-পটে শোভমান হইয়াছেন। কোকিলের কুহুস্বর, ভ্রমরের গুঞ্জনে চারিদিক বীণা-নিনাদিত হইতেছে। প্রমোদ-উদ্যানের পুষ্প-সৌরভে, আহা মরি, কি মধুরিমাই ছড়াইতেছে! এমন সময়ে, সুচারু-বেশে সুসজ্জিতা হইয়া, সুচারু-মোহন হাবভাব দেখাইয়া, হেলিতে দুলিতে, এক সুযৌবন-সম্পন্না সুদর্শনা রাজ-পুরনারী সেই যুবকের নিকট উপস্থিত—হাসি হাসি মুখে, আধ আধ কথায়, তাহাকে মোহিত করিবার জন্য অগ্রসর। মত্ত-মাতঙ্গের গতি অথবা যৌবনোন্মাদিনী চঞ্চলগামিনী কলনাদিনী তটিনীর খর-বেগ—সে সকলও রোধ করা যায়। কিন্তু, এ গতি রোধিবে কে? যুবতীকে দেখিয়াই, যুবক অমনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন; দ্রুত-পদে অগ্রসর হইয়া, যুবতীকে সকাম-আলিঙ্গন জন্য, উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এত মেদ—এত বীর্য্য কে রোধিতে পারে? কার সাধ্য—তখন আর সে যুবতীকে রক্ষা করে!

কিন্তু, একি অপরূপ সম্মোহন মন্ত্র—যুবক একেবারে নিশ্চল! যুবতী যেই বলিলেন,—"আর কেন মিছা! রাজা

যেজন্য তোমাকে এখানে এনেছেন, আহা, কেমন ক'রে— কোন পাষাণে বুক বেঁধে—তা' বলি তোমায়? কাল মা-জগদম্বার পূজায় তোমায় বলি দেওয়া হ'বে; রাজা তাই বল্‌তে পাঠালেন, —'তুমি কালকের জন্য প্রস্তুত হও।' যুবক অমনি নিস্তব্ধ! "কি! কি! কি বল্লে? কাল আমায় মা-জগদম্বার কাছে বলি দেওয়া হবে—আমি তারই জন্য প্রস্তুত হব—তাই তুমি আমাকে বল্‌তে এলে!" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই, যুবক একেবারে অচৈতন্য। সে বিষাদ-দৃশ্য—সে শোক-কথা, আহা, বর্ণন আর কি করিব, পাঠক-পাঠিকে, একবার মনে মনেই ভাবিয়া দেখুন!

*   *   *   *

গুরুদেব তখন, নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন,— "দেখিলে বৎস—দেখিলে! বুঝিলে বৎস—বুঝিলে, আমি কিরূপে এত সংযমী! দেখ বৎস, এত মেদ-বীর্য্যবান পুরুষকেও, একবারমাত্র মৃত্যুকে স্মরণ করিতে হওয়ায়, নিশ্চল হইতে হইল! আর আমি, বৎস, দিনরাত্রি কেবল সেই মৃত্যু-চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছি—সদাই ভাবিতেছি,—'ঐ মৃত্যু! ঐ আসে! কিন্তু কই, এখনও তো ভগবানকে ডাকা হ'ল না! বেলা গেল, তবে তাঁকে আর কখন ডাক্‌বো?' বৎস! এই ভাবনাই আমার নিশিদিন! তবে বল দেখি, কেমন করিয়া আমি অসংযমী বা চঞ্চল-চিত্ত হই? যে মৃত্যু-চিন্তা একবারমাত্র করিতে হইলে, মানুষ জ্ঞানশূন্য—অচৈতন্য—দিশেহারা হইয়া পড়ে, আমি দিবারাত্রি সেই চিন্তাতেই মগ্ন! তবে, বল দেখি, বৎস! আমার আর চাঞ্চল্য কিরূপে থাকিবে? তাই বলি,

এখনও যদি ঈশ্বরকে পাইতে চাও, তবে এখনও সংযমী ও স্থিরচিত্ত হও। এখনও ভাব,—'দিন তো ফুরায়ে এল, ডাকা হলো না! শিওরে শমন বসিয়া, ভাবিবারও আর সময় নাই। এখনও মন-প্রাণ-ভরে ডাক। এখনও সময় আছে—এখনও একবার তাঁরে ডেকে নেও।' বৎস! এই চিন্তাই ভবসংসার-পারের একমাত্র উপায়—ইহাতেই সংযমী ও স্থিরচিত্ত হওয়া যায়—ইহাতেই উদ্ধারের পন্থা প্রশস্ত হয়। অধিক আর কি বলিব? বৎস! এখনও সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী মৃত্যু-চিন্তার আশ্রয় অবলম্বন কর—এখনও উপায় হইবে। জীবের এই এক গতি-মুক্তিই সমীচীন।"

সাধু-বেশের মহিমা।

সাধু-সহবাসে অমৃত ফল, সাধু-সঙ্গে অনন্ত মোক্ষ---একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন; বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ—সকল ধর্ম্মগ্রন্থেও এ কথার ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ প্রকটিত আছে। আমরা সে কথা মনে রাখি, আর না রাখি; আমরা সে উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করি, আর না করি; কিন্তু আমরা শৈশব হইতেই এ সাধু-সহবাস-মহিমা জ্ঞাত বা শ্রুত হইয়া আছি। এইরূপ সাধু-বাক্য, সাধু-আচার, সাধু-কার্য্য, সাধু-বেশ—সাধু-পুরুষদিগের এসকল সাধুচিত ব্যবহার-বেশাদির গুণাগুণও আমরা কিছু-না-কিছু অবগত আছি। হিন্দু-শোণিত-শুক্রের সংযোগ-পোষণের সহিতই, কি

জানি কোন্ অলক্ষ্য গতিতে, এ সকল শাস্ত্রতত্ত্ব আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রবেশিত হইয়াছে—পরিস্ফুট-চেষ্টও সততই। কিন্তু কি কাল-মাহাত্ম্য, যতই তাহাদের স্ফূরণাশা, ততই তাহাতে বিপর্য্যয়! বার্দ্ধক্যে শোণিত-শুক্রের পরিপুষ্টির সহিত, কোথায় আমরা সে সকল সাধু-পন্থায় সাগ্রহে অগ্রসর হইব, তা-না ততই আমরা—কতকটা কলি-শাসিত সমাজের সংস্রব-দোষেই—বিপথে পরিচালিত হইতেছি! কি আক্ষেপ! কি মর্ম্ম-বেদনা!

আজকাল আমরা একে তো সকল জানিই না; আর যা' কিছু জানি, তাহাও মনে রাখি না। অধিক কি, আমাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে যে সকল তত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন; ক্রোড়ে ধরিয়া, যত্ন করিয়া, যে সকল কার্য্য আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন; আজকাল সে সকলও আমাদের কাছে 'গল্প'! যে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা—এখন আমরা মনে করি, তাহা অদ্ভুত অলৌকিক গল্প! এই ধরুণ, এক সাধু-সঙ্গের কথা! নব্য-বাবুরা হয় তো বলিবেন,—"ড্যাম সাধু-সঙ্গ! আপনি ঠিক হলেই সব ঠিক! বেশ্যালয়ে থাকিয়াও ঈশ্বরারাধনা হইতে পারে।" এইরূপ, সাধু-বেশের কথা পাড়িলে, তাঁহারা তো বিদ্রূপ করিয়াই উড়াইয়া দিবেন! কিন্তু, কি তাহার মহিমা, কি তাহার আকর্ষণী শক্তি, সাহস করিয়া বলিতে পারি, বিজ্ঞানও, সে তত্ত্বের আবিষ্কারে হারি মানে!

সাধু-সঙ্গের কথা দূরে থাকুক, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে, আজ সামান্য একটি সত্য-ঘটনায়, সাধু-বেশেরও যে কি অপার মহিমা, আপনাদিগের নিকট তাহাই বর্ণনা করিব।

এক রাজ-পরিবার ও তাঁহাদের রাজ সংসারের এক নীচতম ভৃত্য। ভৃত্য, প্রতিদিনই, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই, সেই রাজপুরে গমন করে; এবং যথাবিধি আপনার দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগত হয়। বার-মাসই—আজীবনই সে এই কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু একদিন—একদিন তার আর গৃহে ফিরিতে মন চায় না! তার মন যেন কেবলই বলে,—"চোখ, চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ!" চোখও আর ফিরিতে চাহে না—পলকও আর পড়ে না। রাজ-ভৃত্যের কিছুকাল এমনই ভাব! তারপর, সে ততোধিক বিমর্ষ! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, সে মনে মনে বলিল,—"যদি তাঁকে পাই, তবেই এ জীবন রাখ্‌বো; নহিলে, এই পর্য্যন্তই সব শেষ!" এই ভাবিয়াই, ধীরে ধীরে—তার পা যেন আর সরে না, তার মন যেন আর মানে না—অতি ধীরে ধীরে, অগত্যা তাহাকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে হইল। আজ তার ঘরে ফিরিতে, অন্যদিন অপেক্ষা অবশ্য, অনেক বেলাই হইয়াছিল।

ঘরে আসিয়াও, আজ তার তেমনই বিমর্ষ ভাব! স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে,—"আজ তুমি কেন অমনতর হয়ে রয়েছ! অত বিমর্ষ কেন? শরীর ভাল আছে তো!" কিন্তু উত্তর নাই! এক-বার, দুইবার, তিনবার! স্ত্রী বারবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করে; অথচ কোনই উত্তর নাই। এদিকে বেলাও তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। স্ত্রী তখন, পায়ে ধরিয়া—তাহার নিজেরই বা কোন অপরাধের দরুণ তাহার স্বামী অমন চটিয়াছেন ভাবিয়া—যোড়-করে আবার বলিল,—"স্বামী, প্রভু! তোমার কি হয়েছে, বল! আমার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর।

অথবা তোমার জন্য যদি কিছু কর্‌তে হয়, বল, আমি প্রাণ দিয়েও তা কর্‌তে রাজী আছি।"

"প্রাণ দিয়েও তা কর্‌তে রাজী আছ?"—স্বামী আবার বলিল,—"তুমি প্রাণ দিয়েও তা কর্‌তে রাজী আছ!"

"হাঁ! হাঁ! আমি সত্যই বল্‌ছি!"—এই বলিয়াই, রাজ-ভৃত্যের সেই সাধ্বী স্ত্রী আবার বলিল,—"বল তবে! বল, তোমার জন্যে আমায় কি কর্‌তে হ'বে! আমি প্রাণ দিয়েই তা কর্‌তে রাজী আছি।"

স্বামী, একান্ত বিষাদ-স্বরে, আবার বলিতে লাগিল,—"পার্‌বে তুমি—পার্‌বে! তবে শোন! আজ আমি, রাজ-অন্তপুরে, আমার নিত্যকর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে, যাঁকে দেখেছি, একবার তাঁকে না পেলে, আমি আর এ জীবন রাখ্‌বো না! সেই রাজকন্যা—আহা, সেই অলোকসামান্য রূপ—আর কি কখন তাঁকে দেখ্‌তে পাব? প্রিয়ে, আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা, আর একবার তাঁরে আমি দেখ্‌তে চাই! সে রূপ—সে সৌন্দর্য্য, আমায় পাগল করেছে, আহা! তাঁকে আমি একবার না পেলে, আমার এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না। শুন্‌লে!—শুন্‌লে আমার কথা! এখন, পার তো তাঁরে দেখাও; নইলে, এই চল্লেম—এই আমি জন্মের মতই চল্লেম।" এই বলিতে বলিতে, পাগলের মত, সে যেন পলাইবার জন্য চেষ্টিত হইল।

সে চেষ্টায় স্ত্রীকেও কিন্তু বিষম ভাবনায় পড়িতে হইল। স্ত্রীর মনে প্রথমতঃই উদিত হইয়াছিল,—"এ কি দুরাশা! তিনি রাজকন্যা, আর আমরা কীটানুকীট রাজ-ভৃত্য! কি ক'রে এ কাজ সম্ভবপর হয়? প্রাণ দিলেও তো এ হবে না!" যাহাই

হউক, পরক্ষণেই, মনে মনে কি ভাবিয়া, অন্ততঃ তখনকার সে উদ্বেগে বাধা দিবার জন্তও, সে বলিল,—"আচ্ছা, তাই হ'বে! রাজ-কন্তাকেই আমি এনে দেব! এখন তো তুমি স্থির হও! তারপর, আমি যা' যা' করতে বলি, তাই ক'রো—অবশ্যই রাজ-কন্তাকে পা'বে।"

"তুমি যদি বাস্তবিকই তা' ক'রে দিতে পার, তবে তুমি যা' বলবে, আমি তাই করতে রাজী আছি।"—স্বামী, এই বলিয়া, স্ত্রীর সেই কথায় বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্ত্রী তখন, প্রথমতঃ স্বামীকে একটু সুস্থ করিয়া, অনেক ভাবনার পর, এক অপূর্ব্ব কৌশল বাহির করিল। বলিল, —"তবে পর—এই গেরুয়া; মাথায় দেও—এই জটা; গায় মাখ —এই ভস্ম; ধর—এই চিমটে। তা'র পর, চল—আমার সঙ্গে; চল, সেই শ্মশানে—চতুর্দ্দিকে শব-বেষ্টিত হইয়া—কৃত্রিম ঈশ্বর-আরাধনায় ব্যাপৃত হ'বে। খবরদার, কারুর সঙ্গে কথা ক'য়ো না; খবরদার, কারুর দিকে ফিরে চেও না। দেখি, কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না! এ'তে—তুমি লালাইত হওয়া তো দূরের কথা—দেখি, সেই রাজকন্তা এসে তোমায় চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন কি না! যদি না করেন, যদি তোমায় তাঁকে না দিতে পারি, তবে আমার বৃথা জন্ম—বৃথা পতি-সেবা—বৃথা ক্রিয়া-কর্ম্ম!"

স্বামী, হর্ষোৎফুল্ল-স্বরে বলিল,—"ভাল—ভাল! আমি তা'তেই রাজি আছি। তুমি যা বলবে, আমি তাই-ই করবো।"

স্ত্রী আবার বলিল,—"আর একটা কথা, দেখো, খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে কোনই ভ্রূক্ষেপ ক'রো-না। কেউ মুখে তুলে

দেয়, খেও ; না দেয়, ক্ষতি নেই। রোজ রাত্তিরে আমি গিয়ে তোমায় খাইয়ে আস্‌বো। সাবধান, এর একটি কথাও যেন ভুলো-না!"

স্বামী তাহাতেই স্বীকৃত। তাহার কতই আহ্লাদ! সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! ক্রমে অনুষ্ঠানও সেইরূপ চলিল। যথাবিধি বেশ-ভূষায় সাজাইয়া, যথাবিধি উপদেশ দিয়া, সেদিন রাত্রিতে, স্ত্রী, তাহাকে সেই নগরের অনতিদূরস্থ একটি শ্মশান-ক্ষেত্রে রাখিয়া আসিল।

* * * *

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—কতদিন এইরূপেই কাটিয়া যায়। স্ত্রী কতই কায়-ক্লেশে, একরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই, নিজের ও স্বামীর জীবনধারণ করিতে থাকে। অবশেষে, ক্রমে, একে একে নগরের লোকের সেই সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আজ এ আসিয়া বলে,—"শ্মশানে এক অপরূপ, সন্ন্যাসী আসিয়াছে।" কাল আর একজন আবার তাহাতে একটু মাত্রা চড়াইয়া বলে,—"আহা, সন্ন্যাসীর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! অমুকের অমুক রোগটা অমনি সেরে দিলে!" ক্রমে নগরে এমনি কত কি কথাই উঠিল। হয়ত স্বভাবের গুণে, সেই উপলক্ষে, কত লোকের কতই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে লাগিল ; অথচ সকল বিষয়েই সন্ন্যাসীর এমনই সুযশ! তখন, নগরের কত লোকই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে যায় ; কত লোক তাঁহার উদ্দেশে কত কি মানস করিয়া আসে! কত অপুত্রক তাঁহার নিকট পুত্র-কামনা করিয়া যায় ; কত রোগী নিরোগ-কামনায় তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করে। দিনকতক

নগরের এমনই ভাব! ক্রমে রাজা ও রাজ-অন্তঃপুরেও সন্ন্যাসীর এ আগমন-বার্ত্তা পৌঁছিতে বাকি রহিল না। তাঁহারাও, নাগরিকদিগের মুখে সন্ন্যাসীর নানা অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইতে লাগিলেন; অধিক কি, ক্রমে তাঁহাদের সে সন্ন্যাসী-দর্শন-স্পৃহা বলবতী হইল। রাজা ও রাজ-পুরনারীগণও ক্রমে ক্রমে সেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে সেই রাজ-কন্যা!—কি আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা—একদিন রাজ-পুরনারীগণের সহিত সেই রাজকন্যাও সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সকলে যেমন সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া ইচ্ছানুরূপ বর-প্রার্থনা করেন, আজ রাজকন্যাও সেইরূপ তাঁহার পদতলে! যাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য রাজ-ভৃত্য প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল, সেই অলোকসামান্যা রাজকন্যা আজ এই সন্ন্যাসী-বেশী রাজ-ভৃত্যের পদতলে!—বিধাতার কি এ অপূর্ব্ব লীলা!

* * * *

সন্ন্যাসী-বেশী রাজ-ভৃত্যের স্ত্রী তখন, স্বামীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া, তাহাকে বলিল,—"তবে এস এখন, ঘরে যাই! যা'র জন্য যা', তা'ত হ'লো! তবে আর কেন? যে রাজকন্যাকে একবার দেখ্‌বার জন্য তুমি প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ ক'রেছিলে, আজ অনায়াসে সেই তোমার পদতলে লুণ্ঠিত! তবে এস—এস আমরা ঘরে যাই। আমি তো আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি; এখন এস —তুমি তোমার কর্ত্তব্য-রক্ষা কর।"

কিন্তু সন্ন্যাসীর তখন অন্য ভাব! আর তখন তাহাকে পায় কে? রাজ-ভৃত্য তখন প্রকৃতই সন্ন্যাসী। সে তখন বলিল,

—“আর কেন প্রিয়ে! এ বেশ আর তো আমি ছাড়বো না! প্রিয়ে, সকল বেশের উপর রাজবেশ—কিন্তু এ বেশ যে তার চেয়েও কোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ। রাজা এ বেশের নিকট পদানত; অসূর্য্যম্পশ্যা রাজ-পুরনারীগণ—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণও সহস্র যুগ ধ্যান করিয়া যাঁহাদের দর্শন পান না—এবেশ তাঁহদিগকেও পদানত করিয়াছে। প্রিয়ে, এমন বেশ জগতে আর কি আছে? এ শ্রেষ্ঠ বেশ—এ সুন্দরতম বেশ, তবে বল দেখি, আমি কেমন করিয়া ত্যাগ করি? তাই আর আমার গৃহেও যাইতে ইচ্ছা নাই—সংসারী হইতেও সাধ নাই--কিছুই আমি আর চাই না। প্রিয়ে, যে বেশ আমায় দিয়েছ, যে পথ আমায় দেখিয়েছ, আমি এখন এই বেশে—এই পথেই চলিব। তদ্ভিন্ন, আর আমার গতি-মুক্তি-উপায় নাই। বেশ পেয়েছি--পথ পেয়েছি; এখন, সেই অকূল পথের কাণ্ডারীকে কোথায় পাইব, সদাই এই ভাবনা। রাজকন্যাকে দেখিয়েছ, 'রাজ-পথ' দেখিয়েছ, এখন যদি পার, সেই পথের কাণ্ডারীকে একবার আমায় দেখাও। নহিলে, আর আমি কিছুই চাহি না। আজ আমায় জন্মের মত বিদায় দাও। আমি তাঁহাকে একবার খুঁজে দেখ্‌বো—দেখ্‌বো, তিনি এ পাপ-জন্মা অভাগাকে পার করেন কি না! প্রিয়ে, যাও তুমি, গৃহে যাও—তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমার আর উদ্ধারের কোনই ভাবনা নাই—এখন, দেখি একবার, যদি সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারী শ্রীহরি আমার এ মনস্তাপ দূর করেন!” এই বলিতে বলিতেই, প্রেমাশ্রু-জলে সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তাহার স্ত্রীও, আর সে শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

স্বামী-স্ত্রী তাহারা দুইজনেই তদবধি উদাসী। স্বামীও সেই অবধি আর গৃহে ফিরে নাই ; তাহার স্ত্রীও আর তদবধি সংসারে যায় নাই। সেই হইতেই, তাহারা দুইজনেই দুইদিকে ঈশ্বর-আরাধনায় চলিয়া যায়। দুইজনেই খুঁজিতে থাকে,—কোথায় সেই শ্রীমধুসূদন, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীনারায়ণ !

সাধু-বেশের এমনই মহিমা ! কে বলে, বেশ-ভূষার সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই ? সাধু-বৈষ্ণবের সেই হরিনামাঙ্কিত নামাবলী-রচিত দেহ, শৈব-সন্ন্যাসীর সেই জটা-বল্কল-ভস্ম, অথবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সেই তুলসী-মালা বা মস্তকের শিখা—কে বলিল, এ সকলের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই ? আচার-ভ্রষ্ট বা কদা-চারী হইয়া আমরা তাহার যেরূপই কেন কুব্যাবহার করি না, কিন্তু বাস্তবিকই ঐ সকল প্রক্রিয়ার একটি না একটি উদ্দেশ্য আছেই আছে। আমরা অপব্যবহারকারী, কিন্তু তাহাতে সে সকল অনুষ্ঠান-পরম্পরার দোষ কি ? বুঝিতে না পারিয়া, আমরা মিছামিছি তাহাতে দোষারোপ করি বৈ ত নয় ! নহিলে, বেশ-ভূষার বাস্তবিকই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে—যাহাতে মানু-ষের মনকে টানিয়া লইয়া থাকে। এই সাদা-সিদে কথাতেই ধরুন না কেন, 'হ্যাট-কোট-বুট' 'হাঁকড়াইয়াই' বা আমাদের মনোভাব কিরূপ তমোভাবাপন্ন হয় ; আর সামান্য চটি-জুতা পায় দিয়া, সামান্য চাদর-মাত্র গায়ে দিলেই বা মনে কিরূপ নিরীহ ভাবের উদয় হয় ? তাই বলি, সাধু-সহবাস, সাধু-বেশ—সাধু-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই অমৃত-ফল ! ভ্রান্ত আমরা, তাই হেলায় সে ফল হারাইয়া থাকি।

নাস্তিকের ঈশ্বর-ভক্তি।

প্রথম।

মানুষের মনে, কিরূপে কখন্ কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আজ আমি পরম পাষণ্ড; পিতামাতা-গুরুজন, কতই সদুপদেশে—কতই যত্ন-চেষ্টায় আমাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই আমি তাঁহাদের সে শুভ-বাণী শুনিতেছি না—যেমন তেমনিই পাষণ্ড-দুরাচার রহিয়া যাইতেছি। অথচ, হয় তো এমন একদিন আসিতে পারে,—যেদিনের একটি সামান্য ঘটনায় বা সামান্য কথায় আমার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, কিরূপে কখন্ কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। নহিলে, অমন পাষণ্ড-নাস্তিক জগাই-মাধাই পরম হরিভক্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, কি প্রকারে? নহিলে, সামান্যা মেছুনীদের মুখে "বেলা গেল—পারে যেতে হ'বে" শুনিয়া, স্বর্গীয় লালা বাবু সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন, কেন? নহিলে, এহেন বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল বেশ্যা চিন্তামণির মুখে—"আমায় যে ভালবাসা দিয়েছ, যদি ভগবানকে তা' দিতে"—এই কথা শুনিয়াই বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন কেন? ফলতঃ, কি ক্ষণে, কি কথায় যে, কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কেহই বলিতে পারেন না।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! একটি পরম পাষণ্ড-নাস্তিকের চরিত্রে, আজ এই এক ক্ষণ-রহস্য বিবৃত করিব। দেখুন, কি কথায়, কি ভাবে, মানুষের কিরূপ অবস্থা বর্ত্তিতে পারে!

একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ন্যায়-তর্কশাস্ত্রে তিনি সমূহ বুৎপন্ন। তাঁহার মনে সদাই এই তর্ক—ঈশ্বর আছেন কি না! এই তর্ক লইয়াই তিনি প্রায় জীবনপাত করিতে বসিয়াছেন। অথচ, আজিও তিনি মীমাংসা করিতে পারিলেন না যে, ঈশ্বর আছেন কি না! অধিকন্তু, ক্রমেই তাঁহার সে তর্কের ক্ষুরধারে ঈশ্বরের স্বত্বা অপ্রমাণিতই রহিয়া যাইতেছে। তিনি কেবলই এই প্রতিপন্নে উপনীত হইতেছেন যে,—'ঈশ্বর নাই।' কেহ তাঁহাকে তাহা বুঝাইতেও পারে না; কেহ তাঁহার নিকট ঈশ্বরের স্বত্বা-সাব্যস্থ্য করিতেও পারে না। তাঁহার সে তর্ক-চ্ছটায়—তাঁহার সে যুক্তি-জালে সকলের কথাই আবৃত হইয়া যায়; তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন যে,—ঈশ্বরের কোনই স্বত্বা নাই, স্থতরাং তাঁহাকে পূজা করিবার বা মানিবারও কোনই প্রয়োজন নাই।

এইরূপেই বহু বর্ষ কাটিয়া যায়। নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহোদয়ের মন আর কিছুতেই ফিরে না। অধিকন্তু, তাঁহার শিষ্য-সেবক-ভৃত্যগণও ক্রমে সেই শিক্ষাই পাইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয় একবার শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। সঙ্গে এক উৎকল-দেশীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তলপী-বাহককে তলপী-বাহক, আবার এদিকে রাঁধুনীকে রাঁধুনী। অর্থাৎ এই চলিত কথায় যেমন বলে,—"বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী।" এও ঠিক তাই। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রায় সমস্ত কাজই ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে—আর লোক-জন না পাইলে, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের ঈশ্বর-বিষয়ক তর্কটা-আস্‌টাও চলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরটির নাম

হলধর ত্রিবেদী। ত্রিবেদী-ঠাকুর, উৎকল-দেশীয় স্বভাবসিদ্ধ গুণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, কিছু বোকা বোকা!

শিষ্য-বাড়ী আহারের প্রচুর আয়োজন। যা কিছু সুখাদ্য আছে, যা' কিছু ভাল তরকারী পাওয়া যায়, শিষ্য-মহাশয়, স্বীয় গুরুদেবের জন্য, তাহার প্রায় সকলই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। দধি-দুগ্ধ-মৎস্য প্রভৃতি গ্রাম্য বাজারে যাহা কিছু উপাদেয় দ্রব্য মিলিয়াছে, শিষ্য-মহাশয় সে সকল তো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেনই; অধিকন্তু, তৎসন্নিহিত সহর হইতেও নানা সুখাদ্য আনয়ন করিয়াছেন। সেই সকল সুখাদ্যের মধ্যে একটি 'বাঁধা কপি' আনিয়াছেন। 'বাঁধা কপি' তখন সবে নূতন উঠিয়াছে; তাই, অনেক যত্ন করিয়া—বেশী দাম দিয়াও, গুরুদেবের জন্য একটি 'কপি' আনিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু রন্ধনের ভার ত্রিবেদী-ঠাকুরের উপর। পণ্ডিত মহোদয় তাঁহার শিষ্যকে তত্ত্ব-কথা শুনাইতেছেন; আর, এদিকে, রন্ধন গৃহে বসিয়া ত্রিবেদী-ঠাকুর রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত আছেন।

* * * *

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত। গুরুদেব আহারে বসিয়াছেন। গণ্ডূষ-মাত্র করিয়া, মুখের গ্রাস তুলিতেছেন; এমন সময়, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—কপির তরকারী কই? সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য-মহাশয়ও বলিয়া উঠিলেন,—"কই ঠাকুর, কপির তরকারী কই?"

ত্রিবেদী-ঠাকুর, স্বীয় স্বভাব-সুলভ চপল হাসি হাসিয়া, উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর মশাই, বল্‌তে ভুলেছি, ছি ছি, কপিওয়ালা বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

"সেকি? এ কি বলিস্?"—গুরু-শিষ্য দু'জনের মুখেই সবিস্ময়ে এই কথা।

ত্রিবেদী-ঠাকুর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সত্যিই! সত্যিই বল্‌ছি! বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

"আরে মলো যা! ঠকিয়েছে—ঠকিয়েছে কি? কথাগুলো খোলাসা করেই বল্-না!"

ত্রিবেদী-ঠাকুরের মুখে তখনও হাসি। ঠাকুর তখনও বলিলেন,—"সত্যিই বল্‌ছি—সত্যিই বল্‌ছি—বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

বারবার সেই একই কথায়, গুরু-শিষ্য দু'জনেই বিশেষ চটিয়া, ঠাকুরকে যেমন আক্রমণ করিতে উদ্যত; ঠাকুর তখন, কতকটা বুঝিতে পারিয়াই, বলিলেন,—"তাই-ই তো বল্‌ছি! সবই পাতা—সবই পাতা! বেটা তো কপি দেয়-নি; সবই কপির পাতা দিয়েছে। বল্‌বো কি, ঠাকুর মশাই, কপির যতই ছাড়াই, ততই পাতা—কপি আর তার ভেতর একটুও নেই—সবই পাতা—সবই পাতা। বেটা বড়ই ঠকিয়েছে—বড়ই ঠকিয়েছে।"

এই বলিতে বলিতে, ত্রিবেদী-ঠাকুর, ক্রমে কপিওয়ালার পিতৃ-মাতৃ-উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া দিল।

গুরু-শিষ্য দু'জনেই তখন চটিয়াছেন। বেশীর ভাগ, গুরুদেব, একেবারে সপ্তমে চড়িয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"বেটা আহাম্মুক্, বেটা উজ্‌বুক্, বেটা উল্লুক! বেটা কপি কখনও তোর বাপের জন্মে দেখিস্-নি; তবে তুই কপি রাঁধতে গেলি কেন? যা' তুই দেখিস্‌নি, যা' তুই রাঁধতে জানিস্-নে, কেন, তা' তুই আমায় জিজ্ঞাসা করে নিস্-নি!" গুরুদেব এইরূপ গালি দেন,

আর এক একবার তাহাকে মারিতে উদ্যত হন! সঙ্গে সঙ্গে একটা বাটী ছুড়েই মারেন আর কি! এদিকে শিষ্যেরও সেইরূপ তাড়না!

গো-বেচারী ত্রিবেদী-ঠাকুর, ভয় পাইয়া, কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর-মশাই, আমায় মাপ করুন। আপনার কাছে থেকেই আমার এমন কুমতি হয়েছে। নইলে, নতুন কোন জিনিস রাঁধ্‌তে হ'লে, আগে আগে আমি তা' জেনে নিয়ে তবে রাঁধ্‌তেম। কিন্তু এই কয় দিন আপনার সংসর্গে থেকেই আমার এই দুর্ম্মতি হয়েছে।"

"সেকি, সে কি বলিস্‌, হতভাগা!"—এই বলিয়া, গুরুদেব যেন আরও রাগভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সত্যি!—সত্যিই তাই! আপনার সৎসর্গ-দোষেই আমার এমন হয়েছে। আপনি যেমন সকল শাস্ত্র ঘাঁটেন, সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়েন, অথচ কোথাও ঈশ্বরের স্বত্বা পান না; আমারও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। আমি কপির কেবলই পাতা দেখেছি—কপি দেখ্‌তে পাই-নি। আপনার ন্যায়ই—শাস্ত্রকে ভ্রান্ত ভাবিয়া—উহাতে ঈশ্বর নাই জানিয়া—'কপিতেও' 'কপিকে' দেখিতে পাই নাই। তাই বলিতেছিলাম, আপনার সংসর্গে—আপনার দশাতেই আমাকে পাইয়াছে।" এই বলিতে বলিতে, ত্রিবেদী-ঠাকুর, আরও উচ্চ চীৎকারে, ব্যাকুল-প্রাণে, কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরুদেবেরও সেই হাতের গ্রাস হাতেই রহিল। অন্নমুষ্টি আর মুখে উঠিল না। তিনিও, ত্রিবেদী-ঠাকুরের ন্যায়, কাঁদিতে কাঁদিতে, অন্নত্যাগ করিয়া, পাগলের প্রায়, দাঁড়াইয়া

উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,-- "ঠিক! ঠিক! ঠিক আমি তোমারই মত কপির পাতা হাঁটকাইতেছি, অথচ 'কপি' যে কি, তাহা চিনিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র, উপদেশ—সকলই দেখিতেছি; কিন্তু, বিশ্বাস ব্যতিরেকে, সকলই বৃথা হইতেছে। এই ঈশ্বর, ইহাতেই ঈশ্বর আছেন,—এ বিশ্বাস ব্যতীত, তাঁহাকে বাস্তবিকই কোথায় পাইব? কপির পাতা-ফেলার ন্যায়, শাস্ত্রের ধর্ম্ম-উপদেশ-সকল অবহেলা করিয়া, কোথায় তাঁহাকে পাইব? ঠাকুর! আজ তুমি আমায় দিব্য-জ্ঞান দিলে!—তুমিই আমার পরকালের কাজ করিলে! আজ হইতে তুমি আর আমার ভৃত্য নহ—তুমি আমার গুরুদেব! তোমার নিকট, আজ এতদিনে বুঝিলাম যে, বিশ্বাস-ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া যায় না- তর্কে তাঁহাকে কেহই পাইতে পারে না।"

বলা বাহুল্য, এই অবধিই গুরু-দেবের নাস্তিকতার অপনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন পরম ঈশ্বর ভক্ত হইয়া, দিবা-নিশি ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হন। এখন আবার তাঁহার উপদেশেও অনেক নাস্তিক-পাষণ্ড পরম সুচরিত্রবান হইয়া আসিতেছে। এখন তাঁহারই মুখে সদাই এই কথা,—'ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তাঁহাকে পাইবে। তর্কে বা অন্য কোনরূপে তাঁহাকে কিছুতেই মিলিবে না।' 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর।'

তাই বলিতেছিলাম,—মানুষের মনে, কিরূপ কখন, কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

নাস্তিকের ঈশ্বর-ভক্তি।

দ্বিতীয়।

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার পবিত্র করুণা-ব্যতীত তোমায় আর কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি দয়া করিয়া যাহাকে দর্শন দেও, সেই তোমায় দেখিতে পায়। কি ধার্ম্মিক, কি নাস্তিক—যাহার প্রতি যখন তোমার করুণা-কণা পতিত হয়, সেই তখন তোমায় প্রাপ্ত হয়। নহিলে, প্রভু, অন্যরূপে তোমায় যে কেহ পাইবে—সাধ্য কি ?

আজ একজন পাষণ্ড-নাস্তিকের পাষাণ চরিত্রে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে, দেখুন—কিরূপে তাঁহার করুণা কখন্ কাহার প্রতি পতিত হয়!

এক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক। সে তর্কে, বক্তৃতায়, সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অনস্তিত্বের বিষয়ই সাধারণকে বুঝাইয়া থাকে। তাহার তর্কের নিকট কেহই আর ঈশ্বরের সত্ত্বা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সে সকলকেই বুঝাইয়া দেয় এবং সর্ব্বত্রেই প্রচার করে,—"ঈশ্বর নাই। সুতরাং ঈশ্বর বলিয়া কাহারও উপাসনা বা পূজা করা অনর্থক।"

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া যায়। কেহই আর তাহার সহিত তর্কে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না যে,—ঈশ্বর আছেন। অবশেষে, সংসারের সকলকেই একরূপ তর্ক-যুদ্ধে হারাইয়া, তাহার মনে হইল,—"একবার তপস্বী-ঋষি-সন্ন্যাসীদিগকেও এই তর্কে হারাইব; এবং তাঁহাদিগেরও অকারণ ঈশ্বর-উপাসনা ঘুচাইব!"

এইরূপ স্থির করিয়া, একদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই, সে এক গহন বনোদ্দেশে গমন করিল। সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে, সেই বনে অনেক যোগী-তপস্বী ধ্যানমগ্ন আছেন। তাই সে, একমনে, সেই বনোদ্দেশেই গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে, অবশেষে, তাহার অন্বেষণের ফলও ফলিল; সে দেখিল, অদূরেই এক সন্ন্যাসী ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে ভগবানের আরাধনায় ব্যাপৃত আছেন। দেখিয়াই, সে সেই সন্ন্যাসীর সমীপস্থ হইল; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল, —"কেন আর ঠাকুর—ও কষ্ট কেন? ঈশ্বর কই—কোথায়? আপনি, ঈশ্বর বলিয়া, কাহার ধ্যানে মগ্ন আছেন? ঈশ্বর কি কেহ এ জগতে আছে? কখনই না। ঈশ্বরের স্বত্বাই নাই! কেন আপনি অকারণ আপনার অমন সোণার শরীর এইরূপে ভ্রমবশে মাটি করিতেছেন? উঠুন—ঘরে চলুন। ভাবুন দেখি, কোথায়ই বা আপনার স্ত্রী-পুত্র পড়িয়া আছে; কোথায়ই বা আপনার আত্মীয়-স্বজন! তাই বলি, এখনও উঠুন—এখনও চলুন! আর ভালোয়-ভালোয় যদি তা না করেন, তবে আমার নিকট অগ্রে ঈশ্বরের স্বত্বা প্রমাণ করুন—আমায় তর্ক-যুক্তিতে বুঝাইয়া দেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ একজন আছেন, এবং তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন! নহিলে, আমি আর কোন মতেই আপনাকে ঈশ্বর-পূজা করিতে দিব না। উঠুন—উঠুন—এখনও উঠুন। ভালোয়-ভালোয় না উঠিলে, জোর করিয়াই উঠাইয়া দিব! ভণ্ডামীর রাজত্ব কিছুতেই আর চালাইতে দিব না!"

কিন্তু সাধু নিরুত্তর! তিনি যেমন ধ্যানে বসিয়াছিলেন, তখনও তেমনিই বসিয়া রহিলেন। মুখে কোন কথাও নাই;

কোনরূপ জ্ঞানোদয়ের লক্ষণও নাই। কাজেই ঈশ্বরবিদ্বেষী নাস্তিকের বড়ই ক্রোধ জন্মিল। "আমাকে অপমান! উত্তরটা পর্য্যন্ত দিল না।"—মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই, সে অমনি সাধুর প্রতি সবেগে অগ্রসর হইল; এবং তাঁহার হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। হরি-ধ্যানরত সাধুর, নাস্তিকের অপবিত্র শরীর-স্পর্শেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি অমনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নাস্তিক তখন আবার তাঁহাকে বলিয়া উঠিল,—"কেন ঠাকুর আর ভণ্ডামী? ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বরের স্বত্বাই যে নাই! আগে আমায় তর্কে বুঝাও দেখি, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না; তারপর, আমি বুঝিব যে, তোমাদের ভণ্ডামী সার্থক। নহিলে, জানিও, আমি আর কোন মতেই তোমাকে এরূপে রাজ্যের অমঙ্গল-বিধান করিতে দিব না—তোমাদের দৃষ্টান্তে সংসারের লোক যে সংসার-ত্যাগ করিয়া ও স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া বনবাসী হইবে, এ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিব না। তবে যদি তুমি আমায় দেখাইতে পার যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে আমি অবশ্য অবনত-মস্তকে তোমার দাসত্ব স্বীকার করিব; এবং আমিও গৃহে ফিরিব না—তোমার মত আমিও ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইব। নহিলে, ঠাকুর, জানিও, তোমায়ও আর ঈশ্বরের পূজায় ব্যাপৃত হইতে দিতেছি না; অপর কাহাকেও আর এরূপে সময়ের অপব্যয় করিতে দিব না।"

সন্ন্যাসী-সাধু এবার সকলই শুনিলেন। শুনিয়া, মনে মনে একটু হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষণকাল কি জানি কি একটু

চিন্তা করিয়াই, ভূমি হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিলেন; এবং, হাসিতে হাসিতে, সেই নাস্তিকের গাত্র লক্ষ্য করিয়া, সজোরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তর-খণ্ড বেগে তাহার গাত্রে গিয়া পতিত হইল; নাস্তিক "উ-হু—মা গো—গেলেম গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীও অন্যমুখে সেস্থান হইতে গমনোদ্যোগ করিলেন।

নাস্তিক, তাঁহাকে ডাকিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, আবার বলিতে লাগিল (এবার অবশ্য অনেকটা নরম হইয়াই),—"ঠাকুর! এ কেমন আপনার বিচার? এ কেমন আপনার ঈশ্বর-পূজা? আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তর্ক করিতে আসিলাম বলিয়া আপনার এ কি ব্যবহার? আপনারই অকারণ সময় নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, ভালোর জন্য আমি আসিলাম; আর আমায়ই এমন করিয়া কষ্ট দেওয়া? উ-হু! জ্বলে গেলাম—বড় বেদনা।"

সন্ন্যাসী তখনও মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন,—"কি—কি—বেদনা আবার কি? কৈ, কৈ বেদনা—কোথায় বেদনা? কৈ, বেদনাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি-নে! তবে তুমি মিছামিছি 'বেদনা বেদনা' ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? কৈ, বেদনাকে একবার দেখাতে পার আমায়?"

নাস্তিক (পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুভাবে)।—ঠাকুর, এ কি বিদ্রূপের সময়? বেদনাকে কি আর দেখা যায়? উ-হু! আমি জ্বলে মলেম—জ্বলে মলেম!

সন্ন্যাসী।—কি বল, বেদনাকে দেখা যায় না, তবে তা'র আর সত্তা হ'লো কি করে?

নাস্তিক।--ঠাকুর, সে কি বলেন? অনুভবই যে বেদনার সত্তা? উ-হু, জ্বলে গেলেম!

সন্ন্যাসী।—ভাল!—ভাল! কিন্তু বাপু, অনুভবে তবে ঈশ্বরের সত্তাটাও স্বীকার কর না কেন? বেদনার সামান্য সত্তাটা যখন অনুভবে ঠিক করিয়া লইতে পারিতেছ, তখন একবার অনুভব করিয়াই দেখ দেখি,—'ঐ ঈশ্বর, ঐ পিতা—ঐ তিনি আমার সম্মুখে!' দেখ দেখি, তা'তে তাঁকে পাও কি না! দেখ দেখি একবার, তাতে কত আনন্দ!

বেদনার অশ্রু গিয়া, নাস্তিকের চক্ষে তখন প্রেমাশ্রুর উদয় হইল। সে গদ্গদচিত্তে বলিতে লাগিল,—"সাধু—সাধু আপনি! এতদিনে আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। ধন্য আপনি—ধন্য ঈশ্বরের কৃপা যে, তিনি আমার মত পাষণ্ডের এরূপে উপায়-বিধান করিয়া দিলেন।"

এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে, নাস্তিক আর গৃহে ফিরিল না। তদবধি, সেও, সেই বনে, ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যাপৃত হইল।

কর্ম্ম ফল।

কর্ম্মের ফল অবশ্যই আছে। সুকর্ম্মের সুফল ও কুকর্ম্মের কুফল একদিন না একদিন দেখিতেই পাওয়া যায়। আজ যিনি ধনমদে উচ্ছৃঙ্খল, 'ধরাকে সরা'-সম জ্ঞান করিতেছেন; কাল আবার দেখিতেছি, তিনিই ভিক্ষা-পাত্র-হস্তে সামান্য দীন-বেশে অন্যের দ্বারে অন্নের ভিখারী। আজ যিনি সকলের পূজনীয়

আজ যাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে যাঁহার পাদোদক-পানে অন্যে কৃতার্থ হইতেছে ; কাল দেখিতেছি, অহো তাঁহার কি দুর্দ্দশা !—যাহারা দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল, তাহারাই আবার তাঁহাকে পদাঘাতে পবিত্র করিতেছে। হায় হায় ! এ প্রহেলিকার মর্ম্ম কি ?

ইহার মর্ম্ম কি কর্ম্মফল-ভোগ নহে ? আমার পূজনীয় গুরুদেব এই কর্ম্মফল-সম্বন্ধে একদিন একটি সুন্দর গল্প করেন। সে গল্পটি বড়ই শিক্ষাপ্রদ—বড়ই মনোরম। পাঠক ! গুরুদেবের সে গল্পটি এই :—

"কোন স্থলে হরিদাস এবং রাধানাথ নামে দুই বন্ধু বাস করিতেন। এক সময়ে উভয়েরই ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ; 'তিনি মঙ্গলময়' বলিয়া উভয়েরই ধারণা ছিল ; এবং পুণ্য-কার্য্যে উভয়েরই মতি ছিল। কিন্তু কুক্ষণে রাধানাথের কুমতি ঘটিল—অসৎ সঙ্গী জুটিল—অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া ফেলিল।

হরিদাস, বন্ধুর এ প্রকার দুরবস্থা-সন্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, বন্ধুকে কত বুঝাইলেন ; কত কাকুতি-মিনতি করিলেন ; কত সদ্দৃষ্টান্ত, সদুপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাধানাথ কোন ক্রমেই সৎপথে পুনরাগমন করিতে সম্মত হইল না। বরং উত্তরোত্তর পাপ-পিপাসা তৃপ্তি-সাধন-মানসে, মদিরা-সেবন ও বেশ্যালয়ে গমন করাই আপনার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া নিরূপিত করিল।

একদিন হরিদাস, নিকটস্থ কোন গ্রামে 'মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়, রাধানাথ আসিয়া তাঁহার

হস্ত-ধারণ করিল। হরিদাস, পবিত্র মনে, পবিত্র দেহে, পুণ্যময় 'মহাভারত-পাঠ' শ্রবণ করিতে যাইতেছেন; এ সময় তাঁহাকে স্পর্শ করা যদিও একান্ত অন্যায় কার্য্য বটে, তথাপি সে কথা বোঝে কে? রাধানাথ, মদিরা-সেবনে উন্মত্ত-প্রায়! বেশ্যালয়ে গমন করিবার সময়, হঠাৎ বন্ধু হরিদাসকে দেখিয়া, তাহার বড়ই আনন্দ হইল। সে, একেবারে দৌড়িয়া আসিয়াই, হরিদাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল,—"আচ্ছা, তুমি প্রতিদিনই কি মহাভারত শুনিতে যাও? মহাভারত-শ্রবণে কি তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে; না ভগবান্, ইন্দ্রের সিংহাসন কাড়িয়া তোমায় দিবেন? ভাই, কিছুই হইবে না—কিছুই পাইবে না! অথচ আপনার সুখের জীবন কেন মিছে কাজে নষ্ট কর!"

হরিদাস।—কেন ভাই, মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিলে যে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়, তা' কি তুমি জান না? তুমিই তো এক কালে আমায় এ বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছ; মহাভারত হইতে কত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া, কত তর্কের সৎমীমাংসা করিয়াছ! তবে আজ আবার এমন কথা বলিতেছ, কেন?

রাধানাথ।—কেন বলিতেছি! বলিতেছি, বুঝিয়া-সুজিয়া; বলিতেছি, দায়ে পড়িয়া; বলিতেছি, এখন যথার্থ কথা বুঝিয়াছি বলিয়া; বলিতেছি, তোমায় আজ ফিরাইব বলিয়া; বলিতেছি, বেশ্যালয়ে ও মদিরায় কত সুখ আছে, তাহাই দেখাইব বলিয়া। আর কি চাও?

হরিদাস।—ছি ভাই! একথা আর মুখে এনো না—তোমার বড় পাপ হবে। নিজে ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করেছ—নিজের সর্ব্বনাশ করেছ; কিন্তু আর একজনকে আবার মজাতে

চাও কেন? যাও ভাই! তোমার যেখানে ইচ্ছা, প্রস্থান কর। আমায় ছেড়ে দাও।

রাধানাথ।—আচ্ছা, তুমি আমায় বুঝাও, মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে! স্বীকার করিলাম, ইহাতে পুণ্য আছে। কিন্তু ভাই! সে পুণ্যের ফল তুমি আজ পাইবে, বলিতে পার? ভগবান্ তোমায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন?

হরিদাস।—তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার বিচার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জ্ঞানহীন আমি, কেমন করিয়া বুঝিব? হয় তো তিনি আমায় আজই সুখী করিতে পারেন! দেখ, নিয়তি সকলেরই অনুগামিনী; কর্ম্মফল কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। অবশ্যই ভগবান আমায় সুখী করিবেন।

রাধানাথ, হরিদাসের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া, তখন কহিল,— "আচ্ছা ভাই, তুমি আজ যাও। কিন্তু বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখো,—অতি সহজেই বুঝ্‌তে পারবে যে, তুমি পুণ্য কাজ করেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিপদে পড়্‌ছ! কিন্তু আবার তবু পুণ্য কাজ কর্‌তে যাচ্ছ,—ভবিষ্যতের আশায় কেবল ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে আছ? থাক—ভালই। কিন্তু জেনো, তা'তে তোমার কোন কাজই হচ্ছে না; জীবনে তুমি কোন সুখই পাবে না। আর আমি!—আমি কত সুখে আছি, সে কথা তোমায় আর কি বল্‌ব!" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, রাধানাথ, আপনার গন্তব্য-স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। হরিদাসও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হরিদাসের বিশ্বাস ও ভক্তি, অচল—অটল। তিনি শুনিয়াছিলেন, মহাভারতের

কথা-শ্রবণ করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়—ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস ও ভক্তি বর্দ্ধিত পাইয়া, অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অতএব, তিনি আর সে পথ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বরং রাধানাথের কথায় তাঁহার বড় ঘৃণাই হইল।

এতদিনে, এই দুই বন্ধুর উপরে, ভগবানের সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। হরিদাস, মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিতেছেন; এমন সময়, পথিমধ্যে তাঁহার পদে একটি বিল্বকণ্টক বিদ্ধ হইয়া, অজস্রধারে রক্তপাত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, সেই যন্ত্রণায় শয্যাগত হইলেন। অধিক কি, সেই উপলক্ষে ক্রমে তাঁহার জ্বর হইল; পা পাকিয়া উঠিল; প্রায় তিন মাস কাল তিনি আর শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হইলেন না।

আর রাধানাথ!—সে, রাত্রি-দ্বিপ্রহরের সময় গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তখন, পথিমধ্যে সে একটি হাজার টাকার তোড়া কুড়াইয়া পাইল।

তিনমাস পরে, রাধানাথ এবং হরিদাস উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, রাধানাথ, হরিদাসের সেইদিনকার ঘটনা শ্রবণ করিয়া, কহিল,—"দেখ ভাই, যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক কি না? তুমি মহাভারত-পাঠ শুনিতে গেলে, পুণ্য হইবে বলিয়া—ভগবান্ তোমার ভাল করিবেন বলিয়া; কিন্তু দেখ দেখি, তুমি কি ফল-লাভ করিলে? আর দেখ আমাকে!—আমি অসৎ কার্য্য করিলাম; কিন্তু তাহার দণ্ড পাওয়া দূরে থাক, এক হাজার টাকার একটি তোড়া কুড়াইয়া পাইলাম। এটা দেখিয়া, এখনও তোমার ভাই, বল দেখি, পুণ্যকর্ম্ম করিতে সাধ যায়?—তুমি কর্ম্মফলের

উপর বিশ্বাস কর? কিন্তু, তাহাতে তোমার কি হইল, ভাব দেখি!"

বাস্তবিক এ বিষয়ে হরিদাস অনেক ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার হৃদয়, সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইল; কর্ম্ম-ফলের উপর যেন দৃঢ় বিশ্বাসের হ্রাস হইতে লাগিল; 'অধর্ম্মেরই জয়' এই ধারণায়, তাঁহারও হৃদয়ে যেন বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মতি ফিরিল না; 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এই কথায় যে চির-বিশ্বাস, তাহা একেবারে লোপ পাইল না। তবে মনটা কি জানি, কেমন একরকম হইয়া দাঁড়াইল।

হরিদাস বলিলেন,—"আচ্ছা রাধানাথ! তবে কি এ সকলই মিথ্যা? শাস্ত্র-বেদাদি কি সকলই অসার? শাস্ত্রকারগণ কি সকলেই মূর্খ? সত্যই কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই? কর্ম্মফল কি কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না?"

রাধানাথ স্থির-গম্ভীর প্রশান্ত বদনে উত্তর দিল,—"না, কিছুই নাই; সকলই মিথ্যা। আমি অনেক দেখিয়াছি, তবে এ সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি?"

হরিদাস অনেকক্ষণ অনেক কথা ভাবিলেন। তথাপি ঈশ্বরের অস্তিত্বে কিন্তু অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শেষে, দুইজনে মিলিয়া, ইহার মীমাংসার জন্য একজন সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষের নিকট গমন করিলেন।

মহাপুরুষ উভয়েরই কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"দেখ, তোমাদের বিবাদ আমি এখনই ভঞ্জন করিয়া দিতেছি। তোমরা দুইজনে স্নানাদি করিয়া

পবিত্র দেহে আমার নিকট আইস। আমি সমস্তই বুঝাইয়া দিব।" তখন, হরিদাস এবং রাধানাথ উভয়েই, স্নানাদি করিয়া, পবিত্র-দেহে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন,—"তোমরা দুইজনে দুই ধারে, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ কর। তাহা হইলেই, দুই মুহূর্ত্তের জন্য, তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে। আর, সেই বলে, তোমরা অনায়াসে নিজ নিজ ভূত, ভবিষ্য এবং বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিতে পারিবে।"

তখন, হরিদাস এবং রাধানাথ, ভক্তির সহিত মহাপুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া বসিলেন। এইরূপে, মুহূর্ত্তের মধ্যেই, তাঁহারা আপনাপন ভূত, ভবিষ্য এবং বর্ত্তমান অবস্থার ছবি সন্দর্শন করিলেন। এইরূপ দেখিয়া, পরক্ষণেই, উভয়েই সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ, হরিদাসকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে?"

সাশ্রু-নয়নে হরিদাস উত্তর দিলেন,—"দেখিলাম, যেদিন রজনীতে আমার পদে বিল্ব-কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেইদিন আমার মৃত্যু হইবার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এবং 'কর্ম্মফলে' আমার অচলা ভক্তি ও অনন্ত বিশ্বাস ছিল বলিয়া, সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছি—শমনের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। দেখিলাম, যে স্থলে আমার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই, ঊর্দ্ধফণা কালসর্প আমায় দংশন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমার কর্ম্মফলের ও পুণ্যের বড়ই জোর, তাই ললাট-লিখনও খণ্ডিত হইল। কালসর্প-দংশনের

পরিবর্ত্তে, কণ্টক বিদ্ধ হইয়াই আপদের শান্তি হইয়া গেল। মহাপুরুষ! মুহূর্ত্তের জন্য, আমি মঙ্গলময়ের উপর অচলা বিশ্বাস হারাইয়া যে পাপ করিয়াছি, এখন বলুন—বলুন, তাহার উপায় কি হইবে?"

মহাপুরুষ, এ কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ভবিষ্যৎ কি দেখিলে?" হরিদাসের তখন নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি তন্ময়-ভাবে চক্ষু মুদিত করিয়া উত্তর দিলেন,—"আঃ—কি সুন্দর স্থান! ও স্থানে যদি যাইতে পারি, তবে আর এ পাপ পৃথিবীতে কে থাকিতে চায়? দেব! কবে আমার সে দিন আসিবে?"

মহাপুরুষ।—কবে তোমার সে দিন আসিবে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও নাই?

হরিদাস।—না, তাহা দেখিতে পাই নাই। অন্ধকার—অন্ধকার! কেবল অন্ধকার—অনন্ত অন্ধকার! আমার সমস্ত জীবন অন্ধকারময়! আমি তার পর কেবল তাই দেখিয়াছি।

মহাপুরুষ তখন রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি দেখিলে?"

রাধানাথ, মহাপুরুষের পদ-প্রান্তে পড়িয়া, এতক্ষণ অজস্রধারে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিল। এক্ষণে, মহাপুরুষের কথায়, ক্রন্দন করিতে করিতে, উত্তর দিল,—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহা বলিবার নয়। উঃ! সে যাতনা অসহ্য! সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!—অতি ভয়ঙ্কর!!"

মহাপুরুষ।—কি, বল?

রাধানাথ।—আমি দেখিলাম, আমি যদি সৎপথে

থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, সেই দিনে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতাম। কিন্তু, আমি বিশ্বাসহীন, আমি নরাধম, আমি ঘোর পাষণ্ড! তাই হেলায় মহারত্ন হারাইয়াছি। বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে কেবল হাজার টাকার তোড়া পাইয়াছি। হায় গুরু! আমার কি আর উদ্ধার নাই?

মহাপুরুষ, সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তা'র পর, তোমার ভবিষ্যৎ কি দেখিলে?"

রাধানাথ, প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া, উত্তর দিল,—"সে কথা একমুখে বলিতে পারি না। উঃ! কি যন্ত্রণা!—কি ভীষণাকৃতি!—কি পূতিগন্ধময় স্থান! নরক—নরক!"

মহাপুরুষ তখন দুইজনকে পদপ্রান্ত হইতে উত্তোলন করিয়া অনেক বুঝাইলেন; অনেক সদুপদেশ দিলেন। শেষে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আবার যোগে বসিলেন।"

গুরুদেবের এই গল্পটির ভিতর কি অলৌকিক তত্ত্ব ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ নিহিত আছে! এ তত্ত্ব—এ জ্ঞানের মর্ম্মোদ্ঘাটন যিনিই করিতে পারেন, এজগতে তিনিই সুখী। ভ্রান্ত জীব আমরা, তাই আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; গুরূপদেশ শুনিয়াই, আবার তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। হা জগদীশ! আমাদের এ ভ্রান্তি কি আর অপনোদিত হইবার নহে? দয়াময় তুমি, আমাদের এ ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেওনা কেন?